প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশক : বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

আমার

স্বর্গত পরমারাধ্য পিতামহ ৺পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী

স্বর্গতা পরমারাধ্যা পিতামহী ৺মুক্তকেশী দেবী

স্বর্গত পরমারাধ্য মাতামহ ৺ভগবান চক্রবর্ত্তী

ও

স্বর্গতা পবমাবাধ্যা মাতামহী ৺নয়নতারা দেবীর ।

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

হিতোপদেশ গ্রন্থখানি পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের পরিবর্তিত সংস্করণ বলে বিবেচিত। রচয়িতা নারায়ণ পণ্ডিত। যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় পঞ্চতন্ত্র রচিত হয়েছিল খৃষ্টীয় ৫০৫ থেকে ৫৩১-এর মধ্যে। কারণ পঞ্চতন্ত্রে বরাহমিহিরের কিছু রচনার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। বরাহমিহির জন্মেছিলেন ৪৭৬ অব্দে আর তিনি লিখেছিলেন ৫০৫ অব্দে। তাতেই মনে হয় পঞ্চতন্ত্রের লেখার কালও ৫০৫ অব্দের পরেই। আবার ৫৩১ অব্দের বেলায় দেখি—পারস্য সম্রাট নাসিরবান এই পঞ্চতন্ত্র সেই দেশীয় ভাষায় সংকলন করেছিলেন। সম্রাট নাসিরবান রাজত্ব করেছেন ৫৩১ অব্দ থেকে ৫৭৯ অব্দ পর্যন্ত। তাতে মনে হয়, ৫৩১ অব্দের আগেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাই ৫০৫ অব্দ থেকে ৫৩১ অব্দের মধ্যেই এই গ্রন্থের রচনাকাল। আর হিতোপদেশ রচিত হয়েছে তারও অনেক পরে বলে অনুমিত হয়।

হিতোপদেশের রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা না গেলেও, যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় একাদশ শতকের কিছু আগে। কারণ নারায়ণ পণ্ডিতের আবির্ভাব মহাকবি 'মাঘ' ও নীতিসার প্রণেতা কামন্দকের পরবর্তীকালে। আর ধারণা করা হয়ে থাকে নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন এই বাংলা দেশেরই অধিবাসী।

পঞ্চতন্ত্রের মত এই হিতোপদেশও একটি নীতিগ্রন্থ। জীবজন্তুর সংলাপের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা—রাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থখানি সেই হিতোপদেশেরই বাংলা রূপ। তবে হুবহু অনুবাদ বলতে যা বোঝায় তা নয়। পঞ্চতন্ত্রে যেমন গদ্যের প্রাধান্য, হিতোপদেশে তেমনি পদ্যের। গল্পগুলি হুবহু অনুবাদ না হলেও শ্লোকের অর্থ মোটামুটি যথাযথ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্লোকের অর্থ সংরক্ষণে শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থখানির টীকার সাহায্য নিয়েছি।

সেকালের সঙ্গে আজকের সময়ের পার্থক্য অনেক। তখন কিশোরদের যা পড়তে দেওয়া যেত এখন তা যায়না। তাই কিছু আদিরসাত্মক গল্পকে গল্পের কাঠামো ঠিক রেখে আদিরসটুকু সযত্নে পরিহার করেছি।

পরিশেষে এর পাণ্ডুলিপি নকল করে আমার স্নেহের মৌসুমী চক্রবর্তী ও পার্থসারথি চক্রবর্তী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

শ্রীকাঞ্চন

কথারম্ভ
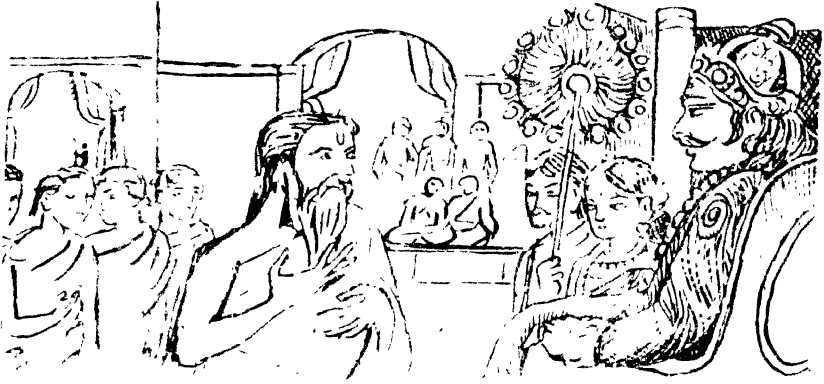
বহুদিন আগে ভাগিরথী নদীর তীরে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর ছিল। সুদর্শন নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন।

কি ছিল না তাঁর? হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, লোকলস্কর, পাইক, বরকন্দাজ, সুখী প্রজা, সবই তাঁর ছিল। প্রজারাও তাঁকে সুশাসক হিসেবে ভক্তি করত।

তিনি নিজেও ছিলেন পরাক্রমশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান। সমস্ত রাজকীয় গুণেরই অধিকারী ছিলেন তিনি।

কিন্তু হলে কি হবে? তাঁর মনে শান্তি ছিল না। তাঁর পুত্রেরা ছিল মূর্খ। রাজার ছেলে মূর্খ হলে চলে? দিনরাত তাদের কথাই চিন্তা করতেন তিনি। আর তাঁর মন খারাপ হয়ে যেত।

লেখাপড়ায় একটুও মন নেই তাদের। সারাদিন কেবল দুষ্টামী আর খেলা।

ছেলেরা মূর্খ। রাজার ভাবনার আর কূল-কিনারা ছিল না। সারা দিনরাত একই ভাবনা—কি করি! রাজকার্যেও তাঁর মন নেই। ভাবতেন—

যে পুত্র বিদ্বান নয়, ধার্মিক নয়, তার জন্মগ্রহণ করে লাভ কি? অন্ধ মানুষের নকল চোখ দিয়ে কি ফল? শুধু শুধু কষ্টই বাড়ে।

অথচ, গুণবান একটি পুত্রও ভাল, শত মূর্খ পুত্রের চেয়ে। একটি মাত্র চাঁদ আকাশের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু আকাশের এত নক্ষত্রও তো তা পারে না।

আক্ষেপ করতেন রাজা। ভাবতেন, হায় রে! আমার ভাগ্য।

ভাগ্য! একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল, ভাগ্য কেন? আমার উদ্যম কোথায় গেল? আমি কি অক্ষম? আমি কি অলস? কথায় তো বলে:

দৈবকে চিন্তা করে নিজের উদ্যম ত্যাগ করবে না। চেষ্টা না করে কেউ তিল থেকে তেল পায় না।

যেমন, এক চাকাতে রথ চলে না, তেমনি পুরুষকার ভিন্ন দৈব সিদ্ধিলাভ করে না। অতএব,

পূর্বজন্মকৃত কর্মই দৈব। আলস্য ত্যাগ করে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করা উচিত।

আমি পিতা। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। না হলে আমি তো তাদের শত্রুতুল্য হব।

রাজা মনে যেন খানিক শান্তি পেলেন। তিনি তার পরদিনই দেশের সব পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন রাজদরবারে

রাজসভা থৈ থৈ। দেশের জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতরা সবাই উপস্থিত। এই সভা যেন এক মহাসভার রূপ ধারণ করেছে।

রাজা এখনও আসেননি রাজসভায়। পণ্ডিতরা একে অপরের পরিচয় গ্রহণ করছেন। এমন সময় নকীবের ঘোষণায় সচকিত হয়ে উঠলেন সবাই। মলিন মুখে রাজা এসে প্রবেশ করলেন রাজদরবারে। দরবারের রীতি অনুযায়ী সবাই উঠে দাঁড়ালেন। রাজার সঙ্গে সঙ্গে

সবাই আসন গ্রহণ করলেন। একটা ছুঁচ পড়লেও যেন শব্দ হয় রাজসভায়। সবাই তাকিয়ে রয়েছেন রাজার দিকে।

সভার দিকে তাকিয়ে রাজার মলিন মুখে যেন হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আচার্যগণ, আজ আমি এক মহাসমস্যায় পড়েছি। আপনারা যদি তার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন সেই আশায় আমি আপনাদের আহ্বান জানিয়েছি।"

সবাই তাকিয়ে রয়েছেন রাজার দিকে।

রাজা বলতে লাগলেন, "আমার বংশধর, আমার পুত্রগণ মূর্খ। পড়াশুনায় তাদের মন নেই। রাতদিন কেবল খেলা আর খেলা, শুধু দুষ্টামী। ভবিষ্যতে তারা কি করবে? তাই ভাবছিলাম আপনাদের মধ্যে কারোর সাহচর্যে যদি তারা মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কারণ এটা তো সত্য:

কাচ সোনার সঙ্গে মিলিত হয়েই মরকত-মণির কিরণ ধারণ করে। মূর্খ পণ্ডিতের সঙ্গে থেকে জ্ঞানবান হয়।

আপনাদের মধ্যে কি কেউ আছেন যে আমাকে এই মহাসমস্যা থেকে উদ্ধার করতে পারেন? তাদের নীতিজ্ঞান দিয়ে এদের মানুষ করতে পারেন?"

অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল রাজসভায়, কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়ালেন না।

আক্ষেপের স্বরে রাজা বলে উঠলেন, "তবে এমন কেউ নেই এ রাজসভায় যিনি আমার মূর্খ পুত্রগণের ভার নিতে পারেন? আমার রাজ্যে এমন কোন পণ্ডিত নেই যিনি এ সমস্যা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন? আমি কি এতই অভাগা?"

"না, মহারাজ", বিষ্ণুশর্মা নামে সকল নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী এক মহাপণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি রাজকুমারদের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেব।"

রাজার চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। বললেন, "পারবেন! পারবেন আপনি?"

"কেন পারব না ? রাজকুমারেরা উচ্চবংশজাত। তারা দুষ্ট বটে, কিন্তু অপাত্র নয়। আমি ছয়মাসের মধ্যেই আপনার পুত্রদের নীতি-শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলব।"

"আঃ! বাঁচালেন আপনি।" বলে রাজা যেন আশ্বস্ত হলেন। রাজসভা সাঙ্গ হল।

রাজা বিষ্ণুশর্মার হাতে তুলে দিলেন রাজপুত্রদের। শিক্ষার ভার নিয়ে তিনি প্রথম দিনই রাজপুত্রদের ডেকে বললেন, "তোমাদের কি করতে ভাল লাগে ?"

"কেন গুরুদেব ?" সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "খেলাধুলা,—।"

"হুম্।" বিষ্ণুশর্মা বললেন, "পড়াশুনা ভাল লাগে না ?"

চুপ করে রইল সবাই, কথার জবাব দিল না।

গুরুদেব আবার বললেন, "আচ্ছা! গল্প শুনতে ভাল লাগে ?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।" বলে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

"বেশ।" গুরুদেব বললেন, "তাহলে আমি আজ তোমাদের পশুপাখীর গল্প বলব। রোজই বলব।"

"পশুপাখীর গল্প ? বাঃ! কি মজা!" বলে হাততালি দিয়ে

উঠল ছাত্রেরা। বলল, "আপনি বলুন গুরুদেব, আমরা মন দিয়ে শুনব।"

"ঠিক তো?" গুরুদেব বললেন।

"হ্যা-অ্যা।" সবাই চেঁচিয়ে উঠল একসাথে।

"শোন তোমরা।" গুরুদেব বললেন, "আজ আমি মিত্রলাভ সম্বন্ধে বলছি। বুদ্ধিমান মানুষ নিরুপায়, দরিদ্র হয়েও বন্ধুদের সাহায্যে নানা কাজ করতে পারে। যেমন কাক ও কচ্ছপ করেছিল।"

"কাক আর কচ্ছপ? কি করল গুরুদেব? বলুন না।" চেঁচিয়ে উঠল ছাত্রেরা।

"শোন।" বলে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন:

"আমি একবার দক্ষিণ দেশের বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে একদিন এক সরোবরের তীরে গিয়ে দেখি, এক বাঘ সরোবরের জলে স্নান করে এক হাতে কুশ ও আর এক হাতে একটা সোনার বলয় নিয়ে সরোবরের পাশের রাস্তার ধারে চুপ করে বসে আছে।

তাকে এভাবে দেখেই আমার খটকা লাগল। ভাবলাম, সে কি চায়, দেখতে হচ্ছে তো! আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের ডালে বসে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হঠাৎ দেখি, এক পথিক সরোবরের কাছে এসেই বাঘ দেখে চমকে উঠল। তারপরেই "ওরে বাবা রে! বাঘ বাঘ" বলে দে ছুট। কিন্তু বাঘ তখন খানিক তার পেছনে পেছনে গিয়ে বলতে লাগল, "যেও না পথিক, যেও না। আমি তোমায় কিচ্ছু করব না। করবার শক্তিই নেই। আমি বৃদ্ধ, দাঁত, নখ পড়ে গেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই দান-ধ্যান

করছি আজকাল। নিরামিষ খাই। এই দেখ না হাতে সোনার বলয়। তুমি এটা নাও পথিক, যেও না।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। পথিক ততক্ষণে ছুটে পালিয়ে গেছে।

বাঘ আর কি করে? সে তারপর আবার এসে বসে রইল সরোবরের তীরে।

এভাবে কত পথিক এল, কত পথিক গেল, বাঘের কথা আর কেউ শোনে না। সবাই পালিয়ে যায় ভয়ে। বাঘও আবার এসে বসে থাকে।

এভাবে অনেকক্ষণ যাওয়ার পরে এক গরীব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এলেন সরোবর তীরে। কিন্তু তিনি তো হঠাৎ বাঘকে দেখেই, "ওরে বাবা রে, বাঘ বাঘ" বলে দিলেন লাফ।

বাঘ ততক্ষণে অনেক চালাক হয়ে গেছে। সেও তক্ষুণি এক লাফে ব্রাহ্মণের সামনে পথ আটকে বলে উঠল, "আরে, আরে! চিৎকার করছেন কেন?"

ব্রাহ্মণ ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছেন: "হায় হায়! আজ বেঘোরে প্রাণটা গেল।"

"না, না, ঠাকুর! কি যে বলেন? আমি বাঘ বটে, কিন্তু আমি বৃদ্ধ। হিংসা করি না। চেয়ে দেখুন, আমি দান করার জন্যে বসে আছি।" বলে বাঘ নানাভাবে ব্রাহ্মণকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ কি আর শান্ত হন? তবুও একসময় বাঘের নানা কথায় ব্রাহ্মণ খানিক শান্ত হয়ে বললেন, "তুমি দানের জন্য বসে আছ?"

"হ্যাঁ, দেখুন না, আমার হাতে সোনার বালা।" বলে বাঘ হাত খুলে বলয়টা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বলল, "এটাই তো আপনাকে দেব বলে বসে আছি।"

সোনার বলয়টা দেখে ব্রাহ্মণের খুব লোভ হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, বাঘ কি সত্য বলছে? আমাকে দেবে এটা? যদি দেয়

তবে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু তবুও কি এতবড় ঝুঁকি নেওয়া উচিত? কারণ—

অনিষ্ট কাজ হতে ইষ্টলাভ হলেও পরিণাম শুভ হয় না।
যাতে বিষ আছে তাতে অমৃতও মৃত্যুর কারণ হয়।

কিন্তু অর্থ? অর্থ উপার্জন করতে গেলে তো বিপদ আসতেই পারে। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ যদি সাফল্যলাভ করতে পারে তবেই তো শুভ। আচ্ছা, এটা পরীক্ষা করে দেখলে হয় না? ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ বাঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি হিংস্র প্রাণী।"

বাঘ তখন হাত জোড় করে বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন ঠাকুর। আমি হিংস্রই বটে, মানে ছিলাম। যৌবনে অনেক হিংসা করেছি। আজ আমি বৃদ্ধ, শক্তিহীন। কেউ নেই আমার। তাই একজন ধার্মিক পুরুষ আমাকে দান-ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেই থেকে আমি রোজ স্নান করে দান-ধ্যান করি। বিশ্বাসের পাত্র তবুও হব না?" বলে বাঘ ব্রাহ্মণের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

দুঃখ লাগল ব্রাহ্মণের। বললেন, "না না, আমি তা বলছি না।"

"না বলতে আর বাকি কি?" বলে বাঘ বলতে লাগল, "আপনি তো জানেন—

ধর্মের আটটি পথ। যজ্ঞ, তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, সত্যবাক্য, সন্তোষ, ক্ষমা ও লোভশূন্যতা।
প্রথম চারটি বলে মানুষ গর্ব করে।
কিন্তু শেষের চারটি থাকে ধার্মিকদের জন্য।
আমি ধার্মিক, লোভশূন্য।

তাই এই সোনার বলয়টা আমি দান করতে চাই। তবুও আমার ভাগ্য দেখুন ঠাকুর, 'বাঘ মানুষ খায়' এই অপবাদ দূর হবার নয়। জানেন ঠাকুর, আমি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছি। আমি জানি, নিজের

প্রাণ যেরূপ প্রিয়, অন্যের প্রাণও তো সেরূপ সাধুরাই তো অন্যের প্রতি দয়া করেন।

আমি জানি ঠাকুর, যিনি—

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায়, পরদ্রব্যকে ঢেলার ন্যায়, আর সমস্ত প্রাণীকে নিজের ন্যায় দেখেন তিনিই সাধু।

তাই আমি ভাবলাম, আপনি গরীব, এই সোনার বলয়টা আপনাকে দান করব।"

অভিভূত হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, "তুমি সত্য বলছ ?"

বাঘ হাতজোড় করে বলল, "আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। এই সরোবরে স্নান করে গ্রহণ করুন এই সোনার বালা।"

আশ্বস্ত হলেন ব্রাহ্মণ। তিনি তাড়াতাড়ি হাতের পোঁটলা-পুঁটলী সরোবরের তীরে রেখে গিয়ে নামলেন জলে। কিন্তু বনের মধ্যে সরোবর। লোকজন তো বড় একটা স্নান করে না এখানে, তাই ঘাট-টাটও নেই, পাঁক-কাদাও পরিষ্কার করে না কেউ। ব্রাহ্মণ খানিকটা নেমেই দেখেন পাঁকে ভর্তি সরোবরটা। তবুও লোভ যাবে কোথায় ? লোভে, লোভে আরও একটু এগিয়ে কোনমতে স্নানটুকু সেরে নিতে যাবেন, দেখেন পাঁকে হাঁটু অব্দি ডুবে যাচ্ছে তাঁর পা। তিনি পড়লেন বিপদে। পিছিয়েও আসতে পারছেন না। এ পা টানেন তো ঐ পা ডুবে যায়। সর্বনাশ ! এদিকে বাঘ বসে আছে পাড়ে। ভয়ে তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন, হায় রে ! হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করে খুব ভাল কাজ করিনি।

বেদপাঠ ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ দুরাত্মার ধর্ম-প্রবৃত্তির কারণ নয়। স্বভাবই প্রবল। গরুর দুধ স্বভাবতই মধুর।

শাস্ত্রেই তো আছে—

নদী, শৃঙ্গী, নখী, অস্ত্রধারী, স্ত্রীলোক, এবং রাজবংশীয়দের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

আর আমি বিশ্বাস করে বসে আছি নখীকে। হায় রে! ললাটের লিখন। এখন বাঘটা না বুঝে ফেলে।

বাঘ কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল। এটা তো তারই চালাকি। ব্রাহ্মণ সরোবরে নেমে কাদায় আটকে গেলে সে লাফিয়ে পড়বে তাঁর উপর। তাই সে যখন দেখল ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই উঠে আসতে পারছেন না, তখন সে চিৎকার করে বলল, "কি হল ঠাকুর? কাদায় আটকে গেছেন? উঠে আসতে পারছেন না? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি তুলে আনছি আপনাকে।" বলে, সে লাফ দেওয়ার উপক্রম করতেই ব্রাহ্মণ চিৎকার করে উঠলেন—।

"আরে, না, না। আমি—"

আর আমি! মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল ব্রাহ্মণের, বাঘ হালুম করে ব্রাহ্মণের উপর পড়ে তৎক্ষণে তাঁর ঘাড় মটকে দিয়েছে।

লোভের শাস্তি পেল ব্রাহ্মণ।

"তাই বলছিলাম··· " চিত্রগ্রীব বলতে লাগল, "আগে সব কিছু না ভেবে লোভ করতে গিয়ে বিপদ না হয়।"

"বিপদ না হয়।" যেন ভেঙচে উঠল একটা পায়রা দলপতির কথার উপরে। বলল, "ইনি যেন জ্ঞান দিচ্ছেন মনে হচ্ছে? ভাল, ভাল।

বিপদ উপস্থিত হলে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

সকল ক্ষেত্রেই তাই। কিন্তু ভোজনের বেলায় নয়।

আরে, পৃথিবীর সকল খাদ্য ও পানীয়তেই যদি সন্দেহ করি, তবে খাব কি? হুম্?

পরশ্রীকাতর, অত্যন্ত দয়ালু, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, অন্যের অন্নে জীবনধারণকারী ও সর্বদা শঙ্কাযুক্ত এরা সবসময়ই দুঃখ ভোগ করে।

জান না তোমরা? না, না, চল খাবার আছে, খেয়ে আসি।" বলে সে সবাইকে নিয়ে তক্ষুণি গিয়ে ঝাপটে পড়ল জালে।

"হা-হা" করে চিত্রগ্রীবও তক্ষুনি তাদের বাধা দিতে গিয়ে পড়ল জালে। ফলে সবাই মিলে গেল আঁটকে।

ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া তাদের মাথায় উঠে গেছে। এর মধ্যে টানাটানি করতে গিয়ে জালে পা গেল আরও জড়িয়ে। তারা তখন বিপদে পড়ে যে পায়রাটা তাদের নিয়ে এসে বসিয়েছিল জালে তাকে যাচ্ছেতাই করে লাগল গালাগালি করতে।

তখন চিত্রগ্রীব বলতে লাগল, "আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। তাকে আর গালাগালি করে কি লাভ? বিপদে পড়েছ বলেই না তাকে গালাগালি করছ। যদি না পড়তে? তাই বলছি, অসংযমী হয়ো না।

> অসংযম বিপদের কারণ হয়। তাকে জয় করাই সম্পদের
> পথ। যে পথ শুভ সে পথেই গমন কর। তার কোন দোষ
> নেই। বিপদে হিতকারী মানুষও তার কারণ হয়......।
> যে মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে তিনিই তো বন্ধু।
> আর যিনি বিপদ থেকে উদ্ধার না করে কেবল তিরস্কার
> করেন তিনি বন্ধু নন।
> কাজেই বলছি অধীর হয়ো না! অধীরতা কাপুরুষের লক্ষণ।
> ধৈর্য ধরে প্রতিকারের বিষয় চিন্তা করা উচিত।
> জগতে উন্নতিকামী পুরুষের নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য
> এবং দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টি দোষ পরিত্যাগ করা উচিত।

তাই আমি ভাবছি আমরা সবাই একসাথে জাল নিয়েই উড়ে চলে যাই। আমরা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একসাথে গেলে ঠিক উড়ে যেতে পারব জাল নিয়ে। সরু সরু দড়ি একসাথে পাকিয়ে হাতিও বাঁধা যায়, না কি বল?"

তারা এসব কথাবার্তা বলছে, আর ব্যাধও কিন্তু চুপ করে বসে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে। সে তো আর পায়রার ভাষা বোঝে না। তাই তাদের ফন্দীটাও সে বুঝতে পারেনি। সে ভাবছিল

ঝটাপটি করে জালে আরেকটু জড়িয়ে যাক পায়রাগুলি তারপরেই গিয়ে ঝাপটে পড়ব।

কিন্তু ঝাপটে পড়া আর তার হল না।

চিত্রগ্রীবের কথায় সব পায়রাই রাজি হয়ে তক্ষণি ঝট করে জাল নিয়ে উঠে পড়ল আকাশে।

তা দেখে ব্যাধ তো তখন আরে, "আরে, গেল, গেল," বলে চিৎকার করে ছুটে এল ঝোপ-ঝাড় ভেঙে।

কিন্তু এলে হবে কি? পায়রাগুলি জাল নিয়ে ততক্ষণে উঠে পড়েছে অনেক উঁচুতে।

ব্যাধ তো তখন "হতভাগা, পাজী, ছুঁচো, আমার জালটা নিয়ে চলে গেল?" বলে চীৎকার করে ছুটল তাদের পেছনে।

কিন্তু ছুটলে কি হয়, ধরতে পারলে তো? পায়রাগুলি তখন আরো অনেক দূরে চলে গেছে।

তবুও ব্যাধ ছুটল তাদের পেছনে। ভাবল, যাবে আর কোথায়? জাল নিয়ে উড়তে উড়তে একটু পরেই পরিশ্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তারা।

কিন্তু সে কি আর পড়ে? প্রাণের দায়ে উড়ে চলেছে পায়রা-গুলি। দেখতে দেখতে তারা জাল নিয়ে মিলিয়ে গেল আকাশে। ব্যাধও তখন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

এদিকে কাক, লঘুপতনক কিন্তু সব লক্ষ্য রেখেছিল। ব্যাধকে ফাঁকি দিয়ে পায়রাগুলিকে জাল নিয়ে উড়ে চলে যেতে দেখে সে তো মহা খুশি। ভাবল, বাঃ! ওদের তো খুব বুদ্ধি। কিন্তু এখন তারা কোথায় যায়, কি করে নিজেদের মুক্ত করে দেখতে হচ্ছে তো। তৎক্ষণাৎ সেও উড়ে চলল তাদের পেছন-পেছন।

লঘুপতনক যে তাদের পেছন-পেছন উড়ে চলেছে পায়রাগুলি কিন্তু খেয়ালই করেনি। তারা উড়ে চলছে তো চলছেই।

একসময় একটা পায়রা দলপতি চিত্রগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, আমরা উড়ে তো চলেছি, কিন্তু কোথায় যাব? জাল থেকে মুক্তই বা হব কি করে?"

চিত্রগ্রীব বলল, "পিতা, মাতা এবং বন্ধু, তিনজনই হিতকারী। তাই আমি ভাবছি, গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্র বনে হিরণ্যক নামে আমার এক ইঁদুর বন্ধু বাস করে, তার কাছেই যাব। সে-ই আমাদের জাল থেকে মুক্ত করবে। তোমাদের আপত্তি নেই তো?"

"না না, আপত্তি কিসের?" সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। "যে বিপদে পড়েছি, এখন আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

তারপর তারা সবাই হিরণ্যকের গর্তের কাছে গিয়ে উপস্থিত।

কিন্তু কোথায় তার বাসা? এ যে অনেক গর্ত চারদিকে। পায়রাগুলি তো হতভম্ব! তারা ভাবল দলপতি ভুল জায়গায় এসে পড়েননি তো! জিজ্ঞেস করল, "প্রভু, আপনার বন্ধু কোথায় থাকেন? এখানে যে দেখছি অনেক গর্ত।"

চিত্রগ্রীব হেসে বলল, "হ্যাঁ, অনেক গর্তই। এখানেই থাকেন তিনি। আসলে কি জান, তিনি বৃদ্ধ, জ্ঞানী, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী। কখন কি বিপদ আসে তার ঠিক নেই তো, তাই তিনি অনেকগুলি গর্তই খুঁড়ে রেখেছেন। দরকার পড়লে একটা না একটা গর্ত দিয়ে উঠে চলে যেতে পারবেন।"

"ও, তাই বুঝি।" আশ্বস্ত হল পায়রারা।

চিত্রগ্রীব বলল, "দাঁড়াও, ডাকছি তাকে।" বলেই চিত্রগ্রীব ডাকতে লাগল তার বন্ধুকে, "হিরণ্যক, ও হিরণ্যক, বাড়ি আছ?"

এদিকে হয়েছিল কি, জাল নিয়ে পৎ-পৎ শব্দে ডানা ঝাপটেই তো তারা এসেছিল গর্তের সামনে। তাদের ডানার পৎ-পৎ শব্দ শুনে হিরণ্যক গিয়েছিল ভয় পেয়ে। তাই সে গর্তে লুকিয়েছিল চুপচাপ। সাড়া দেয়নি।

কাক, লঘুপতনক কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সে লক্ষ্য রেখেছিল সব। হিরণ্যক গর্তে ঢুকে যেতেই সে বলে উঠল, "বাঃ! হিরণ্যক! বাঃ!"

"কে, কে তুমি?" গর্তের ভিতর থেকেই হিরণ্যক জিজ্ঞেস করল।

"আমি কাক, লঘুপতনক। তোমার সঙ্গে মিত্রতা করতে চাই।"

"মিত্রতা?" হিরণ্যক হেসে বলল, "আমার সঙ্গে! এ কি করে সম্ভব? আমি খাদ্য, তুমি খাদক। অতএব বন্ধুত্ব কি প্রকারে হবে? শাস্ত্রেই তো আছে—

ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের মধ্যে প্রণয় বিপদের কারণ হয়। যেমন শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্বে হরিণের বিপদ হয়েছিল। অবশ্য বন্ধু কাক বাঁচিয়েছিল তাকে।

লঘুপতনক বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শোন—।" হিরণ্যক বলতে লাগল—

মগধদেশে চম্পকবতী নামে বিশাল বনে এক হরিণ ও এক কাক বন্ধুভাবে বাস করত। একদিন এক শেয়াল হরিণকে দেখে ভাবল, আহা রে! হরিণটাকে যদি খেতে পারতাম।

কিন্তু খেতে চাইলেই তো খাওয়া যায় না। যা তাগড়াই চেহারা। শিংয়ের গুঁতোতেই তো শেষ করে দেবে তাকে।

তাই সে তার উপর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বুদ্ধি ঠিক করে হরিণের কাছে গিয়ে বলল, "আরে! বন্ধু নাকি! কি খবর? সব ভাল তো?"

হরিণ তো অবাক! বলল, "আমি! আমাকে বলছ?"

"হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলছি বন্ধু!" শেয়াল বলল।

"বন্ধু!" থতমত খেয়ে গেল হরিণ। বলল, "তুমি কে?"

"আমি শেয়াল। নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি। কি জান বন্ধু," বলে শেয়াল চোখ ছলছল করে বলল, "সারা বনে আমার একজনও বন্ধু নেই। বন্ধুহীন হয়ে—"

"না, না, সে কি!" হরিণেরও দুঃখ হল।

"আজ তোমাকে পেয়ে যে কি আনন্দ হয়েছে।" শেয়াল বলল, "আমি তোমার অনুচর হয়েই থাকব।"

"তা বেশ তো। এস না।" বলে, হরিণ তাকে বন্ধুভাবেই নিল।

তারপর তারা সারাদিন বনে বনে ঘুরল। সন্ধ্যাবেলায় হরিণ শেয়ালকে নিয়ে নিজের বাসায় গেল। সেখানে চম্পক গাছে তার কাক বন্ধু বাস করত।

কাকও একটু আগেই তার বাসায় ফিরেছিল। সে শেয়ালকে হরিণের সঙ্গে দেখে জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু! এ কাকে নিয়ে এলে?"

"এ শেয়াল।" হরিণ বলল, "আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য ও এখানে এসেছে।"

শেয়ালকে দেখেই কাকের সন্দেহ জেগেছিল। সে বলল, "বন্ধুত্ব? অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে? না, কাজটা ভাল করনি। তুমি জান না—

অজ্ঞাতকুলশীলকে বাসস্থান দেওয়া উচিত নয়? বৃদ্ধ শকুনও
তো বিড়ালকে বাসস্থান দিয়েই নিহত হয়েছিল।"

"কি রকম? কি রকম?" হরিণ ও শেয়াল দুজনেই বলে উঠল।

"তাহলে শোন।" কাক বলতে লাগল—

ভাগিরথী নদীর তীরে গৃধ্রকূট পর্বতে একটা পাকুড় গাছে বহু পাখি বাস করত। তাদের সঙ্গে একটা কোটরে জরদগব নামে এক বৃদ্ধ শকুনিও বাস করত।

তার বয়স হয়েছে। শরীরে শক্তি নেই। চোখেও ভাল দেখে না। খাবারও জোগাড় করতে পারে না। তাই পাখিরাই দয়া-পরবশ হয়ে তাদের খাবার থেকে খানিকটা দিত। তাতেই তার চলে যেত। প্রতিদানে পাখিরা খাবারের জন্য চলে গেলে সে তাদের বাচ্চাদের আগলে রাখত। পরমানন্দেই ছিল তারা।

একদিন হয়েছে কি, বৃদ্ধ জরদগব তার কোটরে বসে ঝিমুচ্ছে। বয়স হয়েছে তো। পাখিরাও বাসায় নেই। বাচ্চাগুলিও ঘুমুচ্ছে।

এমন সময় এক বিড়াল পাখির বাচ্চার লোভে গাছে উঠে একটা বাসায় গিয়ে হানা দিতেই, একটা বাচ্চা উঠল চেঁচিয়ে—খেয়ে ফেল্লে রে, খেয়ে ফেল্লে। দেখাদেখি সব পাখির বাসায়ই বাচ্চাগুলি উঠল চেঁচিয়ে। লেগে গেল গোলমাল। হৈ-চৈ চিৎকার চেঁচামেচিতে

শকুনির গেল চটকা ভেঙে। সে তাড়াতাড়ি কোটর থেকে বেরিয়ে এসে উঠল চিৎকার করে "কে র‍্যা !"

বিড়াল তো আর জানে না এই গাছে শকুনি আছে। তাকে দেখে তো তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সর্বনাশ! শকুনি? সে বুঝল তার আর নিস্তার নেই। কিন্তু সে জানে—

যতক্ষণ ভয় না আসে ততক্ষণই ভয় করতে হয়, ভয় এলে তার প্রতিকার করতে হয়।

তাই সে তাড়াতাড়ি শকুনির কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে আমি।"

"আমি কে?" শকুনি আবার চিৎকার করে উঠল। সে চোখে কম দেখে বলে, তখনও বিড়ালকে দেখতে পায়নি।

বিড়াল বলল, "আজ্ঞে, আমি বিড়াল।"

"বিড়াল! দূর হ' এখান থেকে।" চিৎকার করে উঠল শকুনি। "না হলে তোকে এক্ষুনি হত্যা করব আমি।"

বিড়াল বলল, "আজ্ঞে,তা না হয় করবেন। আগে আমার কথা শুনুন। তারপর যা হয় করবেন।"

"কি, কি শুনব?" বলে শকুনি রুখে উঠল।

"আজ্ঞে," বিড়াল বলতে লাগল—

জাতির দ্বারাই কি বধের যোগ্য কিংবা পূজার যোগ্য হয়? মানুষের ব্যবহার জেনেই না বধের বা পূজার যোগ্য হয়ে থাকে।"

শকুনি বলল, "কি চাস তুই? কি জন্য এসেছিস, বল।"

বিড়াল বলল, "আজ্ঞে, আমি রোজ গঙ্গা স্নান করি, নিরামিষ খাই। ব্রহ্মচর্য পালন করে চন্দ্রায়ন ব্রত করছি। আপনি ধার্মিক বলে পাখিরা আমার কাছে আপনার প্রশংসা করে। তাই আমি আপনার কাছে ধর্মকথা শুনতে এসেছিলাম। আর আপনি কিনা এমনই ধর্মজ্ঞ যে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। অথচ গৃহস্থধর্মে বলে—

শত্রু এলেও যথাযথ অতিথি সৎকার করা উচিত। গাছও যেমন তার ডালপালা-কর্তনকারী থেকেও নিজের ছায়া সরিয়ে নেয় না। 'এমনকি—

বালক, বৃদ্ধ, যুবকও যদি আসে তারও যথাযথ অভ্যর্থনা জানাবে। অতিথি গুরুর ন্যায় পূজ্য।

জানেন না আপনি—

সজ্জনগণ গুণহীন প্রাণীদেরও দয়া করেন। চন্দ্র তো চণ্ডালের ঘর থেকে ছায়া সরিয়ে নেন না।

"না, না, আমি তা বলছি না।" শকুনি বলল, "মাংস বিড়ালের প্রিয়। অথচ পাখির বাচ্চারা এখানে থাকে। তাই—।"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি যে বলেন?" বিড়াল কানে হাত দিয়ে বলে উঠল, "ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে আমি বীতস্পৃহ হয়েই এই চন্দ্রায়ণ ব্রত করছি। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ মত থাকলেও অহিংসা যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে তো আর ভুল নই। কারণ শাস্ত্রেই তো বলে—

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, অহিংসা শ্রেষ্ঠ তপস্যা, অহিংসা শ্রেষ্ঠ বল, অহিংসা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা পরম মিত্র এবং অহিংসা প্রধান শাস্ত্রজ্ঞান।

ধর্ম একমাত্র বন্ধু। তাছাড়া আর অন্য সব শরীরের সঙ্গে নষ্ট হয়। ঠিক কিনা বলুন?"

এতসব শুনে শকুনি তো থ। সে বলল, "যাকগে, এত যখন বলছিস তখন থেকেই যা।"

বিড়াল মহাখুশি। তারপর দিন যায় আর সে একে একে পাখির বাচ্চাদের কোটরে ধরে এনে খায়। কিন্তু বেশিদিন তো চলে না এসব। একদিন পড়ল ধরা। কিন্তু বিড়াল মহা চালাক। সে আগেভাগে টের পেয়েই পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল শকুনি। কোটরে বাচ্চাদের হাড়গোড় পেয়ে পাখিরা ভাবল শকুনিই খেয়েছে তাদের বাচ্চাগুলি। আর তারপর যা হয়। সবাই মিলে শকুনিকে

করল হত্যা।

তাই বলছিলাম—।" কাক বলতে লাগল, "অজ্ঞাতকুলশীলকে—।"

কথাও শেষ হয়নি তার, শেয়াল রেগে উঠে বলল, "অজ্ঞাত-কুলশীল? আজ্ঞে, প্রথম দিন যখন আপনার সঙ্গে হরিণের দেখা হয় তখন আপনি অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন না? হুঁ! কথায় বলে না—

যেখানে বিদ্বান নেই, সেখানে অল্পবুদ্ধি মানুষও প্রশংসনীয় হয়। যে দেশে বৃক্ষ নেই স দেশে এরণ্ডও বৃক্ষ। আর—
এ আমার আত্মীয়, ও আমার আত্মীয় ক্ষুদ্রহৃদয় মানুষরাই বিচার করে। উদার হৃদয়ের কাছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষই আত্মীয়।

কাজেই হরিণ যেমন আমার বন্ধু, আপনিও আমার বন্ধু।"

হরিণ বলল, "এসব তর্কের দরকার কি?—

এই পৃথিবীতে কেউ কারোর মিত্র বা শত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। ব্যবহার দ্বারা শত্রু বা মিত্র হয়।

তাই বলছিলাম, এস না আমরাও সবাই বন্ধু হয়েই বাস করি।"

কাক বলল, "আচ্ছা, এস।" তারপর তারা তিনজনে মিলেই বন্ধুভাবে বাস করতে লাগল।

এরমধ্যে একদিন হয়েছে কি, শেয়াল হরিণকে সুন্দর একটা ধানের ক্ষেত দেখিয়ে দিয়েছিল। ক্ষেত দেখে হরিণ তো খুব খুশি। তারপর থেকে রোজই সে ঐ ক্ষেতে গিয়ে ফসল খায়।

কিন্তু একদিন সে পড়ল কৃষকের জালে ধরা। সন্ধে হয় হয়। অনেক চেষ্টা করেও হরিণ কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারল না। শেয়াল কিন্তু তক্কে তক্কেই ছিল। সে এসে লক্ষ্য করতে লাগল ছুটে যাবে না তো হরিণটা? যা হোক খুব ভাল হয়েছে। আমার চেষ্টা সফল। এখন কাল সকালে কৃষক এসে যখন তাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটবে তখন দুয়েকটা হাড়-টাড়ও কি আমি পাব না?

শেয়ালকে দেখে হরিণ তো খুব খুশি। বলল, "বন্ধু, দেখেছ,

জালে আটকে পড়েছি। শীগগির আমাকে ছাড়াও। এই তো বন্ধুর কাজ।

যুদ্ধের সময়ে বীরকে, ঋণ পরিশোধের সময় সজ্জনকে, ধনক্ষয়ের সময় স্ত্রীকে আর বিপদের সময়ই বন্ধু-বান্ধবদের জানতে পারা যায়। আর তাছাড়া তো জান বন্ধু—

উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষের সময়ে, রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হলে, এবং শ্মশানে যে উপস্থিত থাকে সেই তো প্রকৃত বন্ধু।"

শেয়াল কিন্তু ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে হরিণ জালে বেশ ভালভাবেই আটকে পড়েছে। সে বলল, "বন্ধু একটা মুশকিল হয়েছে যে! জালের দাঁড়গুলি পশুর নাড়ী দিয়ে তৈরি। আজ রবিবার। এগুলি তো আজ দাঁত দিয়ে স্পর্শ করব না। যাকগে। রাত্রি তো হয়েই গেল। কৃষক তো আর রাত্রিবেলায় আসবে না। আমি নিকটেই রইলুম। কাল ভোরে উঠেই মুক্ত করে দেব তোমাকে। কিচ্ছু মনে কর না।" বলে শিয়াল সেখান থেকে চলে গেল।

এবার কিন্তু হরিণ ঠিক বুঝে গেছে শেয়াল কি চায়। নাহলে কে কবে শুনেছে যে শেয়াল তিথি নক্ষত্র দেখে খায়! যা হোক, এখন হা হুতাশ করে তো আর কিছু লাভ নেই। সে ফ্যাল ফ্যাল করে শেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

এদিকে কাক কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বন্ধুকে। বন্ধু এখনও বাড়ি এল না কেন সে ঠিক বুঝতে পারল না। কোন বিপদ হয়নি তো তার!

যাহোক সে খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে হরিণকে জালে আটকান দেখে তো থ। বলল, "একি বন্ধু?"

হরিণ বলল, "আর বল কেন? হিতকারী বন্ধুর কথা না শোনার ফল। শেয়ালের চালাকি।"

"কি?" রেগে গেল সে। বলল, "কোথায়? কোথায় সেই হতভাগা।"

"আছে কোথাও এখানেই।" হরিণ বলল, "আমার মাংস খাবে না ?"

দুঃখিত কাক বলল, "তখনই বলেছিলাম। আরে—

যে মিত্র অসাক্ষাতে কার্যনাশ করে আর সাক্ষাতে বলে মধুর বাক্য, দুধ দিয়ে ঢাকা বিষের কলসীর ন্যায় তাকে পরিত্যাগ করবে।

দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা এবং মিত্রতা করা উচিত নয়। অঙ্গার জলন্ত অবস্থায় হাত পোড়ায় আর ঠাণ্ডা হলে হাত কাল করে।"

যাহোক তার পরদিন ভোরে লাঠি হাতে কৃষককে আসতে দেখেই কাকবন্ধুকে বলল, "বন্ধু ! কৃষক আসছে। তুমি এক কাজ কর। তুমি মড়ার মত পেট ফুলিয়ে পা টান করে চুপচাপ পড়ে থাক। আমি বসে তোমার চোখদুটি ঠোকরাবার ভান করব। কৃষক ভাববে তুমি মরে গেছ। তাতে সে তোমাকে জাল থেকে মুক্ত করে ফেলে রেখে একটু দূরে গেলেই আমি কা কা করে ডেকে উঠব। তক্ষুনি তুমি উঠে পালাবে। যাও যাও, শুয়ে পড়।"

কি আর করবে হরিণ ? সে বন্ধুর কথামতই শুয়ে পড়ল। কাকও উঠে বন্ধুর চোখে ঠোঁট দিয়ে বসে রইল।

একটু পরে কৃষক এসে হরিণকে দেখে তো খুশি। বলল, "বাঃ ! বাঃ ! নিজেই মরেছিস ?" বলে সে তক্ষুনি তাকে জাল থেকে বের করে ফেলে রেখে যেই না পেছন ফিরেছে, কাক উঠল ডেকে। আর তক্ষুণি তো হরিণ উঠে দে ছুট।

কৃষক তো হতভম্ব। বলল, "আরে, আরে ! পালিয়ে গেল হরিণটা !" বলেই সে রাগে হাতের লাঠিটা মারল ছুঁড়ে।

শেয়ালটা তো আর যায়নি কোথাও ? সে বসেছিল একটা ঝোপে। কৃষক এলে হরিণের হাড়গোড় খাবে সে। কিন্তু তার হল না। লাঠিটা গিয়ে পড়ল তার মাথায়। ফলে, তক্ষুনি সে মরে গেল।

তাই বলছিলাম—হিরণ্যক বলল, "পাপের ফল। আরে কথায় আছে না—

এ জন্মের অত্যধিক পাপপুণ্যের ফল তিন বৎসরে, তিনমাসে,
তিন পক্ষে বা তিন দিনে পাওয়া যায়।"

কাক বলল, "না না, এমন বলবে না। তোমাকে খেলে আমার
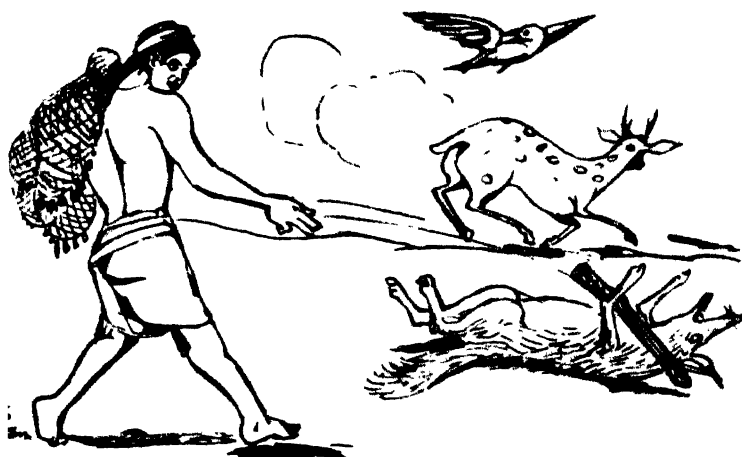
কতটুকু পেট ভরবে? তারচেয়ে তুমি জীবিত থাকলে চিত্রগ্রীবের মত আমারও সুখেই দিন যাবে।

পুণ্যানুষ্ঠানকারী ইতর প্রাণীদের মধ্যেও বিশ্বাস দেখা যায়।
সৎস্বভাববশতই সাধুদের স্বভাবের বিকৃতি ঘটে না।"

"কিন্তু—।" হিরণ্যক বলল, "তুমি চঞ্চল প্রকৃতির। চঞ্চলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত নয়। কথায় আছে—

বিড়াল, মহিষ, ভেড়া, কাক এবং লঘুচিত্ত কাপুরুষকে বিশ্বাস
করলে ক্ষতি হতে পারে তাদের বিশ্বাস করা উচিত তাই নয়।

তাছাড়া তুমি আমার শত্রু। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করা উচিত নয়।"

লঘুপতনক বলল, "সব শুনলাম। কিন্তু তুমি যাই বল, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমি করবই করব। না হলে তোমার বাসার সামনেই আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। তুমি কি জান না—

দুর্জনের সঙ্গে সখ্য মাটির ঘটের মত সহজেই ভেঙে যায়,
আর ভেঙে গেলে জোড়া লাগে না ; কিন্তু সজ্জনের সঙ্গে
বন্ধুত্ব সোনার ঘটের মত সহজে ভাঙে না, আর ভেঙে
গেলেও জোড়া লাগে।

না, না। আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। তুমি তো জান—

পবিত্রতা, ত্যাগ, সাহস, দানশীলতা, সত্যবাদিতা, অনুরাগ ও
সুখদুঃখ অনুভব করাই তো বন্ধুর গুণ।

তাই বলছিলাম তোমার মত এত গুণে গুণান্বিত বন্ধু আমি আর কোথায় পাব ?"

এসব শুনে হিরণ্যক তো অভিভূত। সে বলল, তোমার কথায় আমি সত্যিই সন্তুষ্ট। বুঝলাম মিত্রের যেগুলি দোষ যথা—

গুপ্ত কথা প্রকাশ, প্রার্থনা, নির্দয়তা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, ক্রোধ,
মিথ্যাবাদিতা, অক্ষক্রীড়া—

এগুলির কোনটাই তোমার নেই। ঠিক আছে। তুমি যা চাও তাই হবে।" বলে হিরণ্যক লঘুপতনকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে সুখেই দিন কাটায়।

দিন যায়। একদিন লঘুপতনক বলল, "বন্ধু এখানে তো আর খাবার পাচ্ছি না। তাই ভাবছি, চল না অন্য কোথাও যাই।"

হিরণ্যক বলল, "বন্ধু—

দাঁত, চুল, নখ ও মানুষ স্থানভ্রষ্ট হলে ভাল লাগে না। এসব
জেনেশুনে বুদ্ধিমানেরা নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে না।"

"না বন্ধু।" কাক বলল, "কি বলছ তুমি ? এতো কাপুরুষের মত কথা হল।

জীবিকা উপার্জনের জন্য বীরপুরুষ, সিংহ, হাতি, এরা স্থান
ত্যাগ করে। কাপুরুষ, শশকজাতীয় প্রাণীরাই নিজ বাসভূমে
থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বীরপুরুষের কাছে স্বদেশই বা কি, বিদেশেই বা কি ? সে যে

দেশেই যায় সেই দেশই সে বাহুবলে অধিকার করে। যেমন নখ, দাঁত, লেজরূপ অস্ত্র নিয়েই তো সিংহ যে বনে যায় সে বনেই সে হস্তীশ্রেষ্ঠকে হত্যা করে তার রক্তের তৃষ্ণা মেটায়।"

হিরণ্যক বলল, "বন্ধু! যাবে কোথায়?"

"আছে বন্ধু, আছে।" কাক বলল, "জায়গা ঠিক করাই আছে।"

"কোথায় সেটা?"

"কেন? দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌর নামে একটি সরোবর আছে। সেখানে মন্থর নামে আমার বহুদিনের প্রিয় এক ধার্মিক কচ্ছপ বন্ধু বাস করে। একটা কথা কি জান—

পরকে উপদেশদানের পাণ্ডিত্য মানুষের মধ্যে খুব সুলভ, কিন্তু নিজে ধর্ম অনুষ্ঠান করেন এরূপ সজ্জন বহুর মধ্যে এক-জনেরই দেখা যায়।

তিনিও তাই। আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়নই করবেন।"

"তাহলে আমি কি করব?" হিরণ্যক বলল—

"যে দেশে সম্মান নেই, জীবিকানির্বাহের উপায় নেই, বন্ধু নেই, বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় নেই সে দেশ পরিত্যাগ করাই উচিত।

ধনী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং চিকিৎসক এই পাঁচ যেখানে নেই সেখানে বাস করাই উচিত নয়।

জীবিকানির্বাহের উপায়, শাসনভীতি, লজ্জা, দাক্ষিণ্য, ত্যাগশীল এই পাঁচও যেখানে নেই সেখানেও বাস করা উচিত নয়।

তাছাড়া বন্ধু আমি জানি—

ঋণদাতা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, নদী এই চারও যেখানে নেই সেখানে থাকাও উচিত নয়।"

তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।"

কাক বলল, "চল, চল।"

তারপর তারা দুইজনে কথা বলতে বলতে গিয়ে উপস্থিত হল সেই সরোবরের কাছে। দূর থেকে মন্থর বন্ধুকে দেখেই উঠে এসেছিল। তারা কাছে আসতেই মন্থর বলে উঠল, "আরে এস এস বন্ধু। কি আশ্চর্য!" বলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ইঁদুরের দিকে নজর পড়তেই বলল, "আরে আসুন, আসুন। আমার ঘরে আজ দুই অতিথি। কথায় বলে না—

অগ্নি ব্রাহ্মণের গুরু, ব্রাহ্মণ গুরু চতুর্বর্ণের,
পতি গুরু ভার্যার আর অতিথি গুরু সর্বত্র।

আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্যবান আমি।"

কাক বলল, "বন্ধু জান, এ কে? ইনি হলেন পুণ্যকর্মাদের অগ্রগণ্য দয়ার সাগর মুষিকরাজ হিরণ্যক। সকলকে জিহ্বা দিয়ে সর্পরাজও তার গুণকীর্তন করতে সক্ষম হবেন কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাও।" বলেই সে চিত্রগ্রীবের ঘটনাটা তাকে বলল।

মন্থর হিরণ্যককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, "এই নির্জন বনে আপনার আসার কারণ?"

"সে অনেক কথা। বলছি শুনুন।" হিরণ্যক বলতে আরম্ভ করল—

চম্পক নামে এক নগরে পরিব্রাজকদের এক আশ্রম ছিল। সেখানে চূড়াকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক বাস করতেন। তিনি করতেন কি, খাওয়া-দাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত তা মাটিতে গাঁথা একটা হাতির দাঁতের মত লাঠিতে টাঙিয়ে রাখতেন। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি? আমি ঠিক লাফিয়ে লাফিয়ে তা খেতাম।

একদিন হয়েছে কি, বীণাকর্ণ নামে তার এক বন্ধু এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে। দুইজনে কথা বলছেন, এই অবসরে আমিও লাফাচ্ছি খাবারের জন্য। চূড়াকর্ণ কিন্তু ঠিক বুঝেছেন। তিনি তক্ষুনি তার একটা লাঠি দিয়ে মাটিতে ঠকঠক করছেন, আর কথা বলছেন বন্ধুর সঙ্গে। আমি ভয়ে আর যেতে পারছি না।

বীণাকর্ণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি বন্ধু আপনি আমার কথায় বিরক্ত হয়ে ঠক্ ঠক্ করছেন? কথায় বলে—

প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, প্রসন্ন দৃষ্টি, কথানুরাগ, মধুর বাক্য, অত্যধিক স্নেহ এবং সম্মান প্রদর্শন হল অনুরক্ত মানুষের লক্ষণ। আর,

দেখা করতে অনিচ্ছা, পূর্ব উপকার ভুলে যাওয়া,
অপমান করা, দুশ্চরিত্র মানুষের বর্ণনা, কথা প্রসঙ্গে
নাম ভুলে যাওয়া ইত্যাদি বিরক্ত মানুষের লক্ষণ।
আপনি লাঠি নিয়ে ··· ·।"

"না, না।" লজ্জিত হলেন চূড়াকর্ণ। বললেন, "ঠক্‌ঠক্‌ করছি অন্য কারণে। আপনি জানেন না, এখানে একটা ইঁদুর এই লাঠিটাতে টাঙান আমার ভুক্তাবশিষ্ট খাবার খেয়ে ফেলে। তাই তাকে তাড়াবার জন্য আমি ঠকঠক করছি।"

বীণাকর্ণ বললেন, যে "ইঁদুরটা এতদূর লাফিয়ে ওঠে? এতটুকু একটা ছোট ইঁদুর, যে খেতে পায় না সে এত বলশালী সে হয় কি করে? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। শুনেছিলাম—কোন এক বৃদ্ধকে তার তরুণী স্ত্রী হঠাৎ একদিন এমনভাবে আপ্যায়ন করেছিল যার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।"

"কি রকম?" চূড়াকর্ণ বললেন।

"তাহলে শুনুন—" বীণাকর্ণ বলতে লাগলেন—

গল্প ঃ ছয়

বঙ্গদেশে কৌশাম্বী নামে এক নগর ছিল। চন্দনদাস নামে এক বণিক সেখানে বাস করত। অত্যন্ত ধনী সেই বণিক বৃদ্ধ বয়সে ভাবল, নাঃ, একটা বিয়ে করতে হবে আমাকে। ধন যখন আছে আমার তখন মেয়ে কে না দেবে ? সে লীলাবতী নামে এক ধনী বণিক কন্যাকে বিয়ে করল।

বাপ বিয়ে দিয়েছে, মেয়ে আর কি করবে। সে বৃদ্ধ চন্দন-দাসকেই বিয়ে করল। কিন্তু বর তার পছন্দ হয়নি। হয় কখনও ? কে চায় বৃদ্ধ স্বামী পেতে ? তাই লীলাবতীর খুবই খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কি আর করবে সে, উপায় তো নেই।

দিন যায়। বণিক বাড়িতে তো কত লোকই আসে, কত বণিক। একদিন খুব সুন্দর এক বণিকপুত্রকে দেখে লীলাবতীর খুব ভাল লাগল। তাছাড়া হাসিখুশি বণিকপুত্রটি এমন সব গল্প বলতে পারত, যে লীলাবতীর শুনতে খুব ভাল লাগত। বণিকপুত্রটিরও তাই। এমন শ্রোতা পেলে কার না ভাল লাগে ?

বৃদ্ধ স্বামী তো আর এমন গল্প করতে পারে না ? আর তাছাড়া তার সময়ই বা কোথায় ? দিনরাত কেবল ব্যবসা আর ব্যবসা।

লীলাবতীর সময় কাটে কি করে ? তাই সে সময় পেলেই সুযোগমত বণিক-পুত্রের সঙ্গে গল্প করে।

তারপর এমন হল যে তারা কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। বৃদ্ধ বণিক বেরিয়ে গেলে রোজই বণিকপুত্র আসে লীলাবতীর সঙ্গে দেখা করতে। বৃদ্ধ বণিক কিছুই জানে না। পরিচারিকারাও জানে না।

প্রতি দিনের মতো একদিন বণিকপুত্র এসেছে লীলাবতীর সঙ্গে দেখা করতে। বৃদ্ধ বণিক বাড়ি নেই। লীলাবতী বণিকপুত্রকে এনে ঘরে বসিয়ে কথাবার্তা বলছে, এমন সময় হঠাৎ লীলাবতী দেখে বৃদ্ধ বণিক সদর দরজা দিয়ে ঢুকছে বাড়িতে। মাথায় তো বাজ ভেঙে পড়ল তার। বৃদ্ধ বণিক যদি রাগ করে ? কিন্তু শত হলেও তো সে স্ত্রীলোক। তার বুদ্ধি যাবে কোথায় ? কথায় বলে না—

> দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে কূটনীতি জানেন শিক্ষা ব্যতীত আপনা থেকেই স্ত্রীলোকের সে চাতুর্যবিদ্যা আছে।

লীলাবতী তো তক্ষনি ছুটে গিয়ে তার বৃদ্ধ স্বামীকে আপ্যায়ন করে বৈঠকখানায় বসিয়ে পাখার বাতাস করতে করতে নানা কথা বলতে লাগল। স্ত্রীর এত খাতির পেয়ে পরিশ্রান্ত স্বামী তো আহ্লাদে আটখানা। সেও তখন তার সঙ্গে নানাকথা বলতে লাগল। এই অবসরে বণিকপুত্র পালাল।

এদিকে হয়েছে কি, লীলাবতীর বৃদ্ধ স্বামীকে এত আপ্যায়নের ঘটা দেখে এক পরিচারিকার সন্দেহ হয়েছিল—এত আপ্যায়ন কেন লীলাবতীর ? সে তাড়াতাড়ি লীলাবতীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, 'হুঁ'—যা ভেবেছে তাই—বণিকপুত্র পালাচ্ছে। তাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে ফেলল সব—তাই বলি! এই জন্যই তোমার এই আপ্যায়নের ঘটা ?

অবশ্য সে বণিকপুত্রের কথা বলেনি কাউকে, তবে লীলাবতীর

কাছ থেকে এর সুযোগ নিতে ছাড়েনি। বণিকপুত্রের কথা তার স্বামীকে জানিয়ে দেবে এই কথা বলে সে লীলাবতীর কাছ থেকে অনেক অর্থ ও সুযোগ-সুবিধে আদায় করত।

তাই বলছিলাম বন্ধু! এতটুকু একটা ছোট ইঁদুর, এত লাফাতে পারে? খেতেই যদি না পায়, এত শক্তি সে পায় কোত্থেকে? নিশ্চয়ই এর খাবার আছে। আরে, শাস্ত্রে আছে না—

ধনশালী ব্যক্তিই সর্বত্র সর্বকালে শক্তিশালী। রাজার আধিপত্যও ধনের কারণেই।

দাঁড়াও দেখছি। বলে বীণাকর্ণ একটা খোন্তা নিয়ে—" হিরণ্যক বলতে লাগল, "আমার গর্তে হানা দিয়ে আমার সব ধনদৌলত মানে সঞ্চিত খাবার-দাবার নিয়ে গেল। ধনদৌলতই যখন গেল আমার, তখন আর রইল কি? তারপর থেকেই আমি অসহায়, দুর্বল হয়ে দিন কাটাচ্ছি। ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি। এমন সময় একদিন চূড়াকর্ণ আমাকে দেখে বললেন—। অবশ্য বলেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আমার যেন মনে হল বলেছিলেন—

ধনেই লোক হয় বলশালী, হয় পণ্ডিত। দেখ, দেখ, এই পাপিষ্ঠ মূষিক স্বজাতির মতই হয়ে পড়েছে।

অর্থের অভাবে লোক হয় অল্পবুদ্ধি, তার সব কাজ নষ্ট হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ছোট নদীতে থাকে অল্প জল।

এসব শুনে ভাবলাম, নাঃ, এখানে থাকা আর উচিত নয়।

দৈব যেখানে অত্যন্ত বিমুখ, পুরুষকার যেখানে ব্যর্থ, অর্থাভিমানী দরিদ্রের কাছে বনে যাওয়া ছাড়া সুখ কোথায়?

তাই ঘুরেই বেড়াই। বলতে তো আর পারি না কাউকে! জানেন তো—

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহকলঙ্ক, বঞ্চনা, অপমান বুদ্ধিমান মানুষ প্রকাশ করে না।

আয়ু, বিত্ত, গৃহকলঙ্ক, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান,

অপমান নয়টি জিনিস গোপনেই রাখে।

কিন্তু কি করব? ভাবলাম, পরের অন্নে প্রতিপালিত হব! হায়! কি কষ্ট। তবুও জানেন, লোভ যাবে কোথায়? তাই করলাম। চূড়াকর্ণের খাবারই খেতে চেষ্টা করতে লাগলাম? কিন্তু চেষ্টা করলে হবে কি?

লোভেই বুদ্ধি চঞ্চল হয়, জন্মায় উৎকট আকাঙ্ক্ষা, উৎকট
আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ইহজন্মে পরজন্মে দুঃখ পায়।

আমিও পেতে লাগলাম। পরিব্রাজক লাঠি দিয়ে তাড়াতে লাগল আমাকে। ঘুড়ে বেড়াই আর ভাবি—লোভী ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তি আত্মবিরোধী।

যার মন তুষ্ট নয় তার সব কিছুতেই বিপদ। সে অর্থলোলুপ,
অসন্তুষ্ট, অসংযত স্বভাব ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়।

কিন্তু কি করব? মনে হল—

কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্রাদি আত্মীয় ত্যাগ করবে, গ্রামের
স্বার্থে করবে কুলত্যাগ, দেশের স্বার্থে গ্রাম আর
আত্মরক্ষার্থে ত্যাগ করবে সব।

ভাবছিলাম—

বরং, ব্যাঘ্র-হস্তীসঙ্কুল গাছপালার আশ্রয়ে লতাপাতা, ফলমূল,
জল খেয়ে, ঘাসে শয্যা পেতে, গাছের বাকল পরে বাস করা
ভাল, কিন্তু ধনহীন জীবন নিয়ে বন্ধুমধ্যে বাস করা ভাল না।

"এমন সময়—",হিরণ্যক বলতে লাগল, "আমার সৌভাগ্য, এই লঘুপতনকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। এখন তিনিই আমাকে আপনার কাছে এনেছেন।" বলে সে চুপ করে রইল।

মন্থর বলল, "সব শুনলাম। খুব কষ্ট পেয়েছেন আপনি। আপনি কি জানেন না—

অর্থ চরণধূলির মত, যৌবন পাহাড়ী নদীর মত বেগবান,
মানুষের জীবন জলবিন্দুর মত, আয়ু ফেনার মত। অতএব

যে স্থিরবুদ্ধি স্বর্গদ্বার উন্মোচনের মত ধর্মাচরণ করে না সে জরাগ্রস্থ হয়ে অনুতাপে দগ্ধ হয়।

নিজের দোষেই তো কষ্ট পেয়েছেন আপনি, সঞ্চয় করতে গিয়ে। জানেন না—

যে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধনসঞ্চয় করতে ইচ্ছে করে সে পরের ভারবাহী গাধার মত নিজেই ক্লেশ ভোগ করে। আর,

যে যাচককে ধন দান করে না, তার ধনে কি প্রয়োজন? যে শত্রুকে পরাজিত করে না, তার শক্তিতে কি প্রয়োজন? যে বিদ্বান ধর্ম আচরণ করে না, তার শাস্ত্রপাঠে কি প্রয়োজন? যে সংযমী নয়, তার জীবনে প্রয়োজন কি?

তাই বলছিলাম, অতি সঞ্চয় বড় দোষ।

কৃপণের ধন কোন কাজে লাগে না, ব্রাহ্মণের কাজে লাগে না, বন্ধুর কাজে লাগে না, এমনকি নিজের ভোগেও লাগে না। কৃপণের ধন যায় আগুন, চোর আর রাজার পেটে।

তবে হ্যাঁ, সঞ্চয় করবেন, কিন্তু একটু একটু করে। এই দেখুন না, অতি সঞ্চয় করতে গিয়েছিল বলেই তো শেয়াল মারা পড়েছিল।"

"শেয়াল? কি হয়েছিল?" চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

"তাহলে শুনুন—!" মন্থর বলতে লাগল।

গল্প ঃ-সাত

কল্যাণকটক নামে এক জায়গায় ভৈরব নামে এক ব্যাধ বাস করত। একদিন সে তীরধনুক নিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে গেল শিকার করতে। খানিকক্ষণ পরে সে পেয়েও গেল এক শিকার, একটা হরিণ। হরিণটাকে শিকার করে কাঁধে ফেলে সে আসছিল ফিরে। হঠাৎ সে দেখে সামনে একটা ভীষণ দাঁতাল শূয়র। শূয়রটাকে দেখেই তো তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সর্বনাশ! আর বুঝি রক্ষে নেই। শূয়রটা তো তাকে দেখে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তার দিকে লাগাল ছুট! ব্যাধ তখন আর কি করে? তাড়াতাড়ি হরিণটাকে মাটিতে ফেলে ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে টং করে মারল ছুঁড়ে। তীর ঠিক গিয়ে লাগল শূয়রের গলায়। কিন্তু লাগলে হবে কি? তার রোখ কি আর কমে? ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে এসে ধাই করে লাগাল ব্যাধের পেটে এক গুঁতো। ব্যাধ তখন সবেমাত্র আর একটা তীর ধনুকে জুড়েছিল কিন্তু ছুঁড়তে আর পারেনি। গুঁতো খেয়ে পিলে ফেটে ব্যাধ তক্ষুণি 'ওরে বাবা রে' বলে পড়ল ছিটকে। হাতের তীর হাতেই

রয়ে গেল তার। শূয়রটাও এসে পড়ল তার উপর। তারপর দুজনের কি দাপাদাপি।

এদিকে হয়েছে আরেক কাণ্ড। একটা সাপ যাচ্ছিল এখান দিয়ে। সেও পড়বি তো পড় তাদের দুইজনের মধ্যিখানে। ফলে তাদের দাপাদাপিতে সে গেল মরে। তারপর কিছুক্ষণ পরে শূয়র আর ব্যাধও গেল নিশ্চল হয়ে।

এমন সময় কোত্থেকে এক শেয়াল এসে উপস্থিত। সে তো এতগুলি খাবার একসঙ্গে দেখে আনন্দে আত্মহারা। বাঃ! বাঃ! কি মজা! ভাবল, এই খাবারে আমার বহুদিন চলে যাবে।

লোকটাকে দিয়ে একমাস যাবে, শূয়র ও হরিণটাকে দিয়ে দুই মাস, আর সাপটাকে দিয়ে একদিন যাবে। আজ বরং ধনুকের ছিলাটা খাই।

তবুও আর একটা দিন বেশি যাবে। এটা তো নাড়ী দিয়েই তৈরি। কি মজা! শেয়াল তো দুই হাতে তালি দিয়ে এক পাক নেচেই নিল। তারপর এগুতে লাগল সে ধনুকটার দিকে।

এদিকে হয়েছে কি, ধনুকটা তো লোকটার হাতেই ছিল, তীরটাও লাগান ছিল তাতে। লোকটার ও শূয়রটার এত দাপা-দাপিতেও যে কোন কারণেই হোক তীরটা খুলে যায়নি ধনুক থেকে। ঠিক লাগান ছিল।

শেয়াল তো আর অতশত জানেও না, বোঝেও না। সে গিয়ে যেই না মুখ দিয়েছে ছিলাটাতে আর তক্ষুনি টং করে একটা আওয়াজ হয়ে সাং করে তীরটা তার বুকে বিঁধে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালটা তো হুক্—ক্যা—হুয়া বলে চিৎপাত। আর উঠল না সে। মাংস আর খাওয়া হল না তার।

তাই বলছিলাম, অতি সঞ্চয় করার জন্যই তো শেয়ালের এই ফল হল। যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন আর আগের কথা চিন্তা করে কোন লাভ নেই। মন খারাপ করবেন না আপনি।

জানেন তো—

জ্ঞানীরা যা পাওয়ার নয় তা পেতে ইচ্ছে করেন না, যা নষ্ট হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছে করেন না, এমন কি বিপদকালেও মুহ্যমান হয়ে পড়েন না।

বন্ধু, উৎসাহ হারাবেন না আপনি।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও মূর্খ হয়। কিন্তু যিনি শাস্ত্র অনুসারে চলেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। সুচিন্তিত ঔষধের নামেই রোগীর রোগ সারে না।

যাহোক বিবেচনা করেই কাজ করবেন। কষ্ট বলে বলবেন না।

জানেন তো—

সুখ যেমন ভোগ করবেন, দুঃখ এলেও সহ্য করবেন। সুখ-দুঃখ চাকার মতই ঘোরে।

যারা উৎসাহসম্পন্ন, উদ্যোগী পুরুষ, দীর্ঘসূত্রী নয়, জ্ঞানী, সাংসারিক বিষয়ে আসক্তিহীন, যে সাহসী পুরুষ কৃতজ্ঞ, পূর্ব উপকার ভোলেন না, সকল প্রাণীই যার কাছে মিত্র, লক্ষ্মী তার ঘরে আপনিই আসেন।

জানেন না—

বিনা অর্থেই পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মান লাভ করেন, কিন্তু অর্থশালী কৃপণ অনাদর লাভ করেন। সোনার হার গলায় দিয়ে কুকুর কি কখনও সিংহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য শৌর্য গাম্ভীর্য লাভ করে?

যাকগে, আর বেশি বলে কি হবে? আসুন, আমরা এখানেই থাকি"।

লঘুপতনক তো একথা শুনে খুব খুশি। বলল, "ধন্য তুমি মন্থর। সত্যি তুমি আমাদের আশ্রয়স্থল। কথায় বলে না—

গুণী গুণীর কদর করে, নির্গুণ কিন্তু গুণীর সাহচর্যে তুষ্ট হয় না। ভ্রমর অনেক দূরে গিয়েও পদ্মের মধুপান করে,

কিন্তু, ভেক, পদ্মের সঙ্গে একই জলাশয়ে থেকেও পদ্মের মাধুর্য পায় না।

তারপর থেকে তারা তিনজনে একসাথে মিলেমিশে সুখে দিন কাটায়।

এমন সময় একদিন হঠাৎ কোত্থেকে একটা হরিণ ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে উপস্থিত। চোখে মুখে তার ভয়ের চিহ্ন। তা দেখে তো মন্থর গিয়ে পড়ল জলে, হিরণ্যক ঢুকে গেল একটা গর্তে আর লঘুপতনক ঝট করে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের ডালে। কি হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

যাহোক একটু পরে কাক আর একটা উঁচু ডালে উঠে চারিদিকে দেখতে লাগল, হরিণ কিসের ভয়ে ছুটে এসেছে? কিন্তু কিছুই না দেখতে পেয়ে সে আবার বন্ধুদের ডেকে বলল, "বন্ধু হিরণ্যক, বন্ধু মন্থর! উঠে এস। ভয়ের কিছই নেই।"

তারপর সবাই মিলে উঠে এসে হরিণ চিত্রাঙ্গকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু, তুমি কিসের ভয়ে ছুটে এসেছ?"

হরিণ বলল, "আপনারা যদি আমাকে বন্ধু হিসেবে নেন —।"

"কি আশ্চর্য! মন্থর বলল, "এসেছ যখন। তুমি তো বন্ধুই। খাও-দাও, আরামে থাক। যাকগে, তুমি কিসের ভয়ে ছুটে এসেছ?"

হরিণ বলল, "আমি ব্যাধের ভয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"ব্যাধ?" মন্থর বলল, "বন্ধু, এই নির্জন বনে কি ব্যাধ আসে?"

"না, না।" হরিণ বলল, "তা নয়। কলিঙ্গ দেশের রাজা রুক্মাঙ্গদ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। এখন সন্ধে হয়েছে বলে তিনি ভাগিরথীর তীরে শিবির স্থাপন করেছেন। শুনেছি, কাল ভোরে তিনি নাকি এই কর্পূরগৌর সরোবরে সৈন্য-সামন্তসহ আসবেন। তাই ভাবছি, আমাদের এখানে থাকা তো উচিত নয়।"

হরিণের কথা শুনে তো সবার মুখ শুকিয়ে গেল।

মন্থর বলে উঠল, "তাহলে, তাহলে তো আমাকে অন্য জলাশয়ে

যেতে হয়। আপনারা কি বলেন বন্ধু ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" হরিণ আর কাক বলে উঠল।

হিরণ্যক গম্ভীর হয়ে বলল, "তা ভাল। মন্থর যদি অন্য একটা জলাশয় পেয়ে যায় তবে ভাল। কিন্তু স্থলপথে যাবে কি করে সে ? কথায় বলে না—

জলচর প্রাণীদের কাছে জল, দুর্গনিবাসীদের কাছে দুর্গ, শ্বাপদের কাছে নিজ বাসস্থান আর রাজার কাছে সৈন্য বা মন্ত্রীই হল বল।

তাই বলছিলাম—" হিরণ্যক বলতে লাগল, যাচ্ছে যাক, কিন্তু আমরা না তার বিপদ দেখে দুঃখিত হই। যেমন বণিক দুঃখিত হয়েছিল তার স্ত্রীকে দেখে।"

"বণিক দুঃখিত হয়েছিল কিরকম ?" সবাই তাকিয়ে রইল হিরণ্যকের দিকে।

"তাহলে শোন—" হিরণ্যক বলতে লাগল :

কান্যকুব্জের রাজা বীরসেন একবার তুঙ্গবল নামে এক রাজপুত্রকে বীরপুর নগরের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি যেমন ছিলেন ধনশালী তেমন ছিলেন বিলাসী, খামখেয়ালী।

একবার তিনি নগরে বেড়াতে বেরিয়ে এক বণিকের বাগদত্তাকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মুখে আর কথা সরে না। সেদিন আর বেড়ান হল না তাঁর। বন্ধুবান্ধব, লোকলস্কর নিয়ে ফিরে এলেন প্রাসাদে। দিনরাত সেই বণিকের বাগদত্তার কথাই বলেন তিনি। খান না, দান না। বন্ধুবান্ধবরা পড়লেন বিপদে। তারা নানা কথা বলে নিরস্ত করতে চায় তাঁকে। কিন্তু যুবরাজ কিছুতেই নিরস্ত হন না। বলেন, "তাকে যুবরানী করতে না পারলে আমার জীবনই বৃথা।"

কিন্তু যুবরানী করতে চাইলেই তো আর করা যায় না। বন্ধুবান্ধবরা খবর নিয়ে জানলেন, এ বড় শক্ত ঠাঁই। যে বণিকের বাগদত্তা সে সেই বণিক শুধু বড় ব্যবসায়ীই নয়, অস্ত্রধারণ করতেও সে অদ্বিতীয়। অন্যায় অবিচারে সে কাউকে পরোয়াই করে না। সে তার বাগদত্তা

লাবণ্যবতীকে খুব ভালবাসে। কাজেই বন্ধুবান্ধবরা নানাভাবে যুবরাজকে নিরস্ত করতে চায়। তাছাড়া কান্যকুব্জের রাজার কানে একথা উঠলে সমূহ বিপদ। কিন্তু শুনলে তো রাজপুত্র! লাবণ্যবতীকে তাঁর চাই-ই চাই।

অগত্যা কি আর করে বন্ধুবান্ধবরা। তারা গোপনে এক দাসীকে পাঠালেন লাবণ্যবতীর কাছে। যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনমতে কিছু করতে পারে সে। কিন্তু এ ঠাঁইও বড় শক্ত ঠাঁই। লাবণ্যবতী রাজী তো হলই না বরং কিছু উপদেশ দিয়ে দিল দাসীকে বলল, "আমি যাকে স্বামী বলে জেনে এসেছি তার কথাই আমার কথা। সেই আমার সব। তুমি কি জান না—

যে স্ত্রী গৃহকর্মনিপুণা, পুত্রবতী, পতিপ্রাণা এবং পতিব্রতা সেই ভার্যা।

জান না কি—

যার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট নয় সে ভার্যারূপে খ্যাতিলাভ করে না। স্বামী স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট হলে সর্বদেবতা সন্তুষ্ট হন।"

দাসী তারপর আর কি করে? সে প্রাসাদে গিয়ে যুবরাজের কাছে সব বলে বলল, "প্রভু মেয়েটি অত্যন্ত পতিব্রতা। সে তার ভাবী স্বামীকে ছাড়া আর কিছু জানে না।"

"তাহলে উপায়?" যুবরাজ যেন মাটিতে বসে পড়লেন।

"না প্রভু", দাসী বলল, "হতাশ হবার কিছু নেই—।"

কথাও শেষ করেনি দাসী যুবরাজ বলে উঠলেন, "তবে কি তুই বলছিস, তার ভাবী স্বামী এসে লাবণ্যবতীকে আমার হাতে তুলে দেবে?"

দাসী বলল, "প্রভু! কৌশলে যে কাজ করা যায় শক্তিতে' সে কাজ করা যায় না। হাতি কর্দম পথে গিয়েই না শেয়াল দ্বারা নিহত হয়েছিল।" যুবরাজ বললেন, "কিরকম?"

"তাহলে শুনুন—" দাসী বলতে লাগল:

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামে একটি হাতি বাস করত। দেখতে যেমন বিকট তেমনি বলশালীও ছিল কর্পূরতিলক। হেলেদুলে যখন চলত, তখন দেখবার মতই ছিল সে দৃশ্য। তবে সে ছিল অত্যন্ত নিরীহ। কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের মনেই সে খায় দায় থাকে।

কিন্তু তাহলে কি হয়? তার শত্রুর অভাব ছিল না। বিশেষ করে কতগুলি শেয়াল। তারা ভাবত, ইস তাকে যদি খেতে পারতাম তবে আমরা চারমাস নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু শত হলেও হাতির সঙ্গে জোরে পারবে কি করে তারা?

তাই তারা একদিন সকলে মিলে শলাপরামর্শ করতে বসল, কি করা যায়। কিছুতেই কিছু ঠিক হচ্ছে না, এমন সময় এক বৃদ্ধ শেয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দাঁড়াও, আমি দেখছি। বুদ্ধিবলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।" বলে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে কর্পূরতিলকের সামনে প্রণাম করে হাতজোড় করে বলল, "এই তো প্রভু, আপনি এখানে, আর আমি কত জায়গায় খুঁজছি আপনাকে।"

"কেন কেন ?" হাতি বিস্মিত হয়ে বলল, "আমাকে খুঁজছ কেন ? তুমি কে ?"

"আজ্ঞে, আমি" শেয়াল। শেয়াল বলতে লাগল, বনের সব পশু আপনাকে রাজা বলে অভিষিক্ত করেছেন। তাই তারা সবাই মিলে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে। কারণ—

যিনি কুলাচার, লোকাচার, নিষ্কলঙ্ক বংশসম্ভূত, প্রতাপশালী,
ধার্মিক, নীতিকুশল তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য।

আমরা জানি—

জগতে লোক শাসনভয়েই সৎপথে থাকে। পৃথিবীতে সজ্জন
দুর্লভ। স্বামী নির্ধন, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, পীড়িত হলেও তার
ভয়েই কুলনারী তার প্রতি অনুরক্ত থাকে।

তাই আমি এসেছি। আপনি আমাদের শাসনভার গ্রহণ করুন। আসুন"—বলে শেয়াল তো তক্ষুনি কর্পূরতিলককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। শেয়ালের পেছন পেছন হাতিও চলতে লাগল।

শেয়াল তো মহাখুশি। সে এপথ সেপথ করে যেতে যেতে একটা শুকনো ডোবা পেরিয়ে তীরে উঠে বলল, "আসুন প্রভু, শুভ সময় বয়ে যায়। আসুন।"

ডোবাটা শুকনো ছিল বটে, কিন্তু মাঝখানে ছিল কাদা। উপর থেকে দেখে কিছু বোঝাও যায় না।

হাতি তো অতসব জানে না। সে তাড়াতাড়ি শেয়ালের দেখা-দেখি ডোবা পেরিয়ে যেতে গিয়ে পড়ল কাদায়। এত বড় শরীর, হাতি কাদায় পড়ে আর উঠতে পারে না। পড়ল মুশকিলে। এ পা টানে তো ও পা বসে যায়। সে তখন শেয়ালকে বলল, "ওহে শেয়াল, আমি যে কাদায় ডুবে গেলাম উঠতে পারছি না।"

"সে কি! সে কি!" শেয়াল হেসে বলল, "তাই তো। তাহলে এক কাজ করুন প্রভু, আপনি বরং আমার লেজটা ধরে উঠুন।"

হাতি গেল রেগে। বলল, "কি? তোর লেজ ধরে আমি উঠতে পারব?"

"তাহলে তো মুশকিল।" শেয়াল হেসে বলল, "আমার মত ধূর্তের কথায় যখন বিশ্বাস করেছেন তার ফল ভোগ তো করতেই হবে আপনাকে। জানেন না—

যখন অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করবে তখনই (মানুষ) বেঁচে থাকবে। আর যখন অসৎ সংসর্গ করবে তখন বিপদে পড়বে।

কাজেই ফলভোগ করুন। আমি যাই।" বলে শেয়াল আর সবাইকে ডাকতে চলে গেল।

—তাই বলছিলুম কৌশলেই ব্যবস্থা করতে হবে।" বলে দাসীটি চুপ করল।

যুবরাজ বললেন, "যা ভাল বুঝবি কর।"

তারপর যুবরাজ দাসীর কথামত বণিককে তার একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে নিয়োগ করল।

বণিক এ সবের কিছুই জানে না। সে তো রাজপুত্রের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে মহাখুশি।

দিন যায়। একদিন বণিককে ডেকে রাজপুত্র বললেন, "দেখ, আজ থেকে একমাস আমি এক ব্রত পালন করব। তুমি রোজ সন্ধেবেলা একটি উচ্চবংশসম্ভূত সুন্দরী যুবতী কন্যা আমার কাছে নিয়ে আসবে। সে আমার সমস্ত পুজোর ব্যবস্থা করে দেবে। তার সেই আয়োজন নিয়েই আমি পুজোতে বসব। তারপর পুজো শেষে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। এই ব্রতের এই নিয়ম। যাও।"

খটকা লাগল বণিকের। কিন্তু কিছু করার নেই, যুবরাজের আদেশ। তাকে যোগাড় করে এনে দিতেই হল সুন্দরী তরুণী। তবে লক্ষ্য রাখতে লাগল যুবরাজ তাদের নিয়ে কি করেন। কিন্তু যুবরাজও কম শেয়ানা নন। তিনি রোজ তাদের নিয়ে পুজোর ঘরে যান। তারা তাকে পুজোর যোগাড় করে দিলে তিনি পুজোতে বসেন। তারপর

পুজো শেষে, তিনি তাদের প্রচুর মূল্যবান উপহার সহ রক্ষক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

দিনের পর দিন এ দেখে বণিকের শুধু বিশ্বাসই হল না যুবরাজের উপর, তার লোভও হল। যদি আমি আমার বাগদত্তাকে এনে দিই, তবে তাকেও তো যুবরাজ এসব মূল্যবান সামগ্রী দেবেন। তাই করল সে। তার পরদিনই সে গোপনে লাবণ্যবতীর সঙ্গে দেখা করে তাকে একথা বলতে রাজী হল লাবণ্যবতী। রাজী না হয়ে পারে? সে বণিকঅন্ত প্রাণ। তার কথাই তো আদেশ। গোপনে সে বণিকের সঙ্গে চলে এল রাজবাড়িতে। বণিকও তাকে দিয়ে এল যুবরাজের কাছে। তবে নজর রাখল যুবরাজের উপর।

যুবরাজ তো লাবণ্যবতীকে পেয়ে মহাখুশি। তিনি তক্ষুনি তাকে পুজোর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে গোপনে সেই দাসীকে ডেকে বললেন, "সে তো এসেছে, এখন যা করবার কর।"

বণিক তো নজর রাখছিল যুবরাজের উপর। হঠাৎই কানে এল তার কথাটা। কেমন যেন খটকা লাগল তার। গোপনে সে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

দাসী বলল, "ভাববেন না আপনি। আমি একটু পরেই তাকে ঘুমের ওষুধ মেশান সরবৎ খাইয়ে অচৈতন্য করে চতুর্দোলা করে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখব। তারপর আপনি এরমধ্যে একদিন শুভক্ষণে তাকে বিয়ে করে— ।"

কথাও শেষ হয়নি তার, বণিক রাগে জ্বলে উঠল। কি এতবড় কথা? যুবরাজের ব্রত পালনের ব্যাপার কি তাহলে কৌশল? কিন্তু রাজপ্রাসাদের ভেতরে সে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। দুঃখিত বণিক লুকিয়ে তার বাগদত্তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কি করি? হঠাৎ কি মনে করে সে গোপনে ছুটে গিয়ে রাজপুত্রের বসবার ঘরে দিল আগুন জ্বালিয়ে। মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল সবাই—আগুন, আগুন। যুবরাজও আগুন আগুন শুনে ছিটকে

বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। দাসী চাকর-বাকরেরা তো আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। এই ফাঁকে বণিক একলাফে বেরিয়ে এসে তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়ে তার বাগদত্তাকে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে। টেরটিও পেল না কেউ।

তারপর আগুন নিভিয়ে যুবরাজ ফিরে এসে লাবণ্যবতীকে না পেয়ে তো থ। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বণিক। যুবরাজের মুখে কথা নেই। কি বলবেন তিনি বণিককে ? কিছুই ঠিক করতে না পেরে মাথা নিচু করে তিনি চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

"তাই বলছিলাম", হিরণ্যক বলতে লাগল, "বণিক নিজে দেখেই না দুঃখিত হয়ে পরে কৌশল করেছিল। তাই আপনারও তা চিন্তা করা উচিত।"

এসব কথাবার্তায় মন্থর অত্যন্ত ভয় পেয়ে সরোবর ছেড়ে চলতে লাগল বনের মধ্যে। মন্থর তো যাচ্ছে, কিন্তু স্থলপথে তার কোন না বিপদ হয় এই ভয়ে হিরণ্যক, লঘুপতনক ও চিত্রাঙ্গ হরিণও চলতে লাগল তার পিছনে পিছনে।

কিন্তু মন্থরের ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যেতে না যেতেই সে পড়ল এক ব্যাধের হাতে। ব্যাধ তাকে পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু এদিকে কচ্ছপের তিনবন্ধু গেল ঘাবড়ে। হিরণ্যক বিলাপ করতে করতে চলল ব্যাধের পেছন পেছন দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। হায়, হায় রে !

এক দুঃখের সমুদ্র পার হতে না হতেই দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত।
ছিদ্র পেলেই দুঃখ বিস্তার লাভ করে।
বহু পুণ্যফলে সহজাত বন্ধুলাভ ঘটে। বিপদকালে অকৃত্রিম
বন্ধুকে ত্যাগ করা যায় না।
সহজাত বন্ধুকে যেমন বিশ্বাস করা যায়, মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্রকেও
তা করা যায় না।

হায় রে !

শোক-শত্রু-ভয়ত্রাতা, প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন রত্নস্বরূপ" মিত্র"

এই ছুটি অক্ষর কে সৃষ্টি করেছিল ?"

এসব বিলাপ করতে করতে হিরণ্যক কাক ও হরিণকে বলল, "বন্ধু, ব্যাধ বন থেকে বেরুবার আগেই মন্থরকে মুক্ত করতে হবে !"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক," দুজনেই চিৎকার করে উঠল। বলল, "কি করতে হবে বল।"

হিরণ্যক বলতে লাগল, "তাহলে এক কাজ কর। হরিণ, তুমি সামনের সরোবরের তীরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়। আর তুমি কাক হরিণের উপর বসে তার চোখ দুটি ঠোকরাবার ভান করবে। তাতে ব্যাধ ভাববে হরিণ মরে গেছে। তারপর যেই না সে মাংসের লোভে তোমাদের দিকে যাবে তোমরা তক্ষুনি উঠে পালাবে। আর এদিকে আমি মন্থরের বাঁধন কেটে দিলে সে-ও তাড়াতাড়ি ঝুপ করে সরোবরে গিয়ে পড়বে। যাও, যাও।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।" বলে হরিণ তক্ষুনি ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ল সরোবরের কাছে। কাকও গিয়ে বসল হরিণের উপর।

ব্যাধ তো হরিণটাকে দেখে মহাখুশি। সে তক্ষুনি মন্থরকে একটা গাছের তলায় রেখে ছুটে গেল হরিণের দিকে।

হায় রে ! হরিণ কি ব্যাধকে দেখে আর শুয়ে থাকে ? সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দৌড় দিল। কাকও গিয়ে বসল একটা গাছের ডালে।

"তারপর, তারপর।" একসঙ্গে বলে উঠল রাজপুত্রেরা।

"তারপর আর কি ?" গুরুদেব বলতে লাগলেন, 'ব্যাধ তো এটা ভাবতে পারেনি যে হরিণটা পালিয়ে যাবে ? তাই আর কি করবে সে ? ফিরে এল গাছতলায়। এসে দেখে কচ্ছপটাও নেই। কাটা দড়িটা পড়ে আছে শুধু। তখন সে ভাবতে লাগল, হায়রে !

যে নিশ্চিত জিনিস পরিত্যাগ করে অনিশ্চিত জিনিস অবলম্বন করে তার নিশ্চিত জিনিসও বিফল হয়।

তারপর দুঃখিত ব্যাধ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বাড়ি ফিরে গেল।

এদিকে কাক, মূষিক, কচ্ছপ ও হরিণ তারা চারবন্ধু তারপর সুখে বাস করতে লাগল। বলেই গুরুদেব রাজপুত্রদের বললেন, "কি, কেমন লাগল মিত্রলাভ ?"

"খুব সুন্দর গুরুদেব।" রাজপুত্রেরা বলল, "আমরা বুঝেছি।"

"ঠিক আছে। আজ এ পর্যন্তই। আমি কদিন পরীক্ষা করব তোমাদের, তারপর আবার নতুন গল্প বলব, কেমন ?" বলে গুরুদেব সেদিনের মত তাদের ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

মিত্রভেদ

মিত্রলাভের গল্পগুলি বলার পর গুরুদেব বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের একদিন নানা প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আজ আমি তোমাদের বলব—কি করে এক ষাঁড় ও সিংহের বন্ধুত্ব লোভী, খল-স্বভাব মিত্রভেদ শেয়াল নষ্ট করেছিল।"

"কি করে গুরুদেব ?" রাজপুত্রেরা কাছে এগিয়ে গোল হয়ে বসল।

"মন দিয়ে শোন।" গুরুদেব বলতে লাগলেন :

গল্প ঃ এক
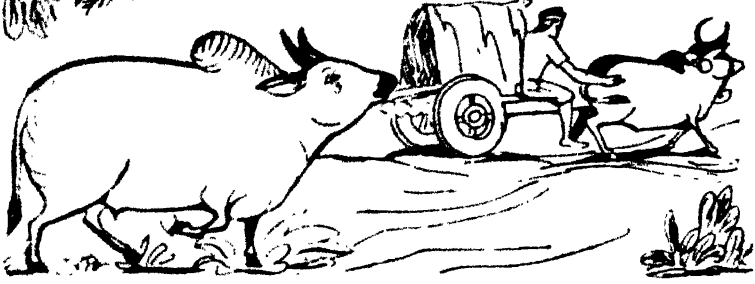
দাক্ষিণাত্যে সুবর্ণবতী নামে এক নগর ছিল। সেখানে বর্ধমান নামে এক ধনী বণিক বাস করত। ধন তার প্রচুর ছিল, কিন্তু তার মনে হত তার বন্ধু-বান্ধবরাই তার চেয়ে অনেক বেশি ধনী। তাই তার মনে দিনরাত অশান্তি। অশান্তি হবে নাই-বা কেন? কথায় আছে না—

নিচ থেকে নিচে তাকালে কার না গৌরব বৃদ্ধি পায়! অথচ উপরের দিকে তাকালে সকলেই নিজেকে দুর্গত বলে মনে করে।

তাই বর্ধমানও নিজেকে দুর্গত বলেই মনে করত। ভাবত, যার প্রচুর অর্থ আছে সে ব্রহ্মহত্যাকারী হলেও পূজ্য হয়। আর নির্ধন ব্যক্তি চন্দ্রের মত নির্মল বংশে জন্মগ্রহণ করেও অপমানিত হয়।

তাই সে ঠিক করল, আলস্য করে বসে থাকলে চলবে না, কিছু একটা করতেই হবে। কারণ সে জানে—

আলস্য, স্ত্রীর বশীভূত হওয়া, রোগ, ঘরকুনো হওয়া, আত্মতুষ্টি এবং ভীরুতা এই ছয়টি দোষ লোকের উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ।

আর তাছাড়া—

যা অলব্ধ তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত, যা পাওয়া গেছে তা করবে রক্ষা, আর সেই রক্ষিত বস্তুকে বর্দ্ধিত করতে হবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তু দান করতে হবে যোগ্য পাত্রকে।

এসব চিন্তা করে সে করল কি, একটা গাড়িতে নানা জিনিস ভর্তি করে নন্দক ও সঞ্জীবক নামে দুইটি বলদকে জুতে চলল বিদেশে বাণিজ্য করতে।

এখনকার মত তখন তো সুন্দর রাস্তাঘাট ছিল না। তখন কোথাও যেতে হলে বন-বাদাড় ভেঙেই যেতে হতো। বণিকও চলছিল গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে বন-বাদাড় ভেঙে; যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যেতে যেতে এক-দিন সামনে পড়ল এক বিশাল বন। বনটা পেরুলেই একটা বিরাট রাজ্য। বণিক সেই রাজ্যেই ব্যবসা করবে বলে স্থির করেছিল। তাই তাড়াতাড়ি সে সেই বন পেরুতে গেল। কিন্তু পথে পড়ল বাধা। হঠাৎ সঞ্জীবক নামে বলদটার পা ভেঙে গেল। থতমত খেয়ে গেল বণিক। এখন উপায়! হঠাৎ তার মনে হল, বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ কথায়ই আছে—

সকল কার্যের বিঘ্নস্বরূপ বিমূঢ়তা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। অতএব আমি বিমূঢ়ভাব ত্যাগ করে স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করব।"

এই চিন্তা করে বণিক গাড়িটা সেখানে রেখে আবার পিছিয়ে গিয়ে অন্য এক গ্রাম থেকে একটা বলদ কিনে নিয়ে এল। তারপর সঞ্জীবককে সেখানে ফেলে নতুন বলদটা গাড়িতে জুতে সে চলে গেল।

সঞ্জীবক পড়ল মুশকিলে। এতবড় বনে সে কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। একে সে আহত, অথচ বনে বাঘ-সিংহের ভয়। সে ভয়ে ভয়েই কোনমতে তিন পায় উঠে দাঁড়িয়ে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগল। কেটেও গেল সেদিনটা। তারপর আরও কিছুদিন

যাবার পর মোটামুটি সে সুস্থ হল ভয়ও কেটে গেলে অনেকটা। কথায় আছে না—

'সমুদ্রে ডুবে গেলে, পাহাড় থেকে পড়ে গেলে, তক্ষক সাপে কামড়ালে যদি আয়ু থাকে তবেই সে-ই জীবন রক্ষা করতে পারে।

যার কেউ নেই তাকে দৈবই রক্ষা করে। দৈব রক্ষা না করলে সুরক্ষিত মানুষও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বনে পরিত্যক্ত অনাথও বেঁচে থাকে, অথচ গৃহে সুরক্ষিত মানুষও জীবিত থাকে না।

সঞ্জীবক তো স্বাধীনভাবে চড়ে খেয়ে শুধু সুস্থই হয়নি, সে হয়ে উঠেছে আরও বলশালী। হাম্বা করে কি গর্জন তার! মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে।

ওই বনে ছিল এক পরাক্রমশালী সিংহ। পাত্র-মিত্র সভাসদ নিয়ে সে রাজত্ব করত সেখানে। বনের পশুরা তার ভয়ে কম্পমান।

একদিন সে গেছে একটা জলাশয়ে জল খেতে। কাছেই ছিল সঞ্জীবক। কেউ কাউকে দেখেনি।

সিংহ জলে নেমে কেবল মুখ ছুঁইয়েছে, সঞ্জীবক হা-ম-বা-আ করে উঠল ডেকে সিংহ চমকে ছিটকে উঠল তীরে। আর তারপর সে কি ছুট! ভয়ে মুখে কথা নেই ছুটে কোনমতে নিজের ডেরায় এসে হাঁফাতে লাগল সে। জানোয়ারটা যে কি কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

ঘটনাটা কিন্তু সিংহের দুই মন্ত্রীপুত্র দমনক ও করটক লক্ষ্য করেছিল। রাজামশায়কে ভয়ে লুকোতে দেখে দমনক করটককে বলল, "এই, কি ব্যাপার বল দেখি? রাজামশায় এমনভাবে লুকিয়ে আছেন কেন?"

করটক বলল, "দূর, দূর! এর কাছে তো আমরা অবজ্ঞাই পাই।

আমরা তো ভৃত্য। আমাদের কি দরকার ? কথায় আছে না—

অর্থের জন্য ভৃত্যরা কি করে লক্ষ্য কর—তারা, মূর্খেরা নিজের স্বাধীনতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

ভৃত্য ছাড়া আর কে আছে যে উন্নতির জন্য নিজেকে নত করে রাখে, প্রভুর জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, প্রভুর সুখের জন্য দুঃখ বরণ করে ?

প্রভুর সামনে ভৃত্য নীরব থাকলে সে মূর্খ, বেশি কথা বললে বাতুল, সহনশীল হলে ভীরু, অসহিষ্ণু হলে সদ্বংশজাত নয়, সর্বদা কাছে থাকলে ধৃষ্ট, আর দূরে থাকলে অযোগ্য। কাজেই সেবাধর্ম বড়ই জটিল যোগীরাও বুঝতে পারেন না।

অথচ দেখ—

ভৃত্য সেবাপরায়ণ না হলে প্রভুর চামর কম্পিত সম্পদ, দণ্ডযুক্ত শুভ্র ছাতা, হাতি ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী কি করে সম্ভব ?

তাই বলছিলাম, জানিস ভাই, আমাদের কোন দরকার নেই। আরে,

যে পরাধিকার চর্চা করতে যায় সে কীলক উৎপাটনকারী বানরের মতই বিনষ্ট হয়।

"তাই নাকি ?" দমনক বলল, "কি রকম ?"

"তাহলে শোন।" করকট বলতে লাগল—
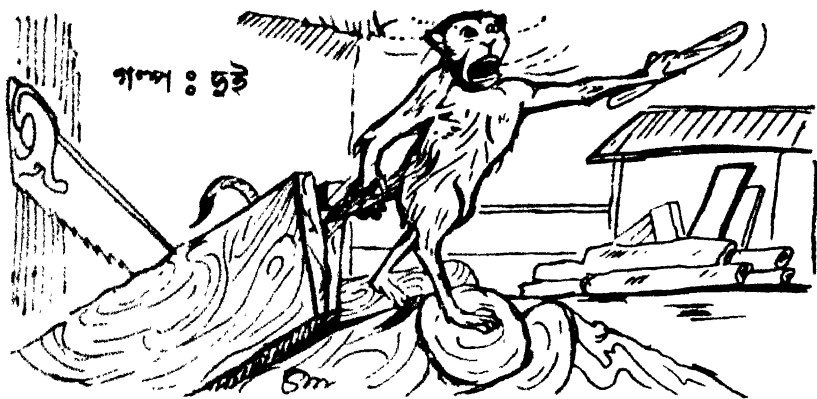
মগধ দেশে কোন এক জায়গায় শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ একবার একটা আশ্রম তৈরি করছিল। সেখানে একদিন এক ছুতোর একটা লম্বা কাঠ করাত দিয়ে অর্ধেকটা চিরে সেই চেরা জায়গায় একটা কাঠের খিল লাগিয়ে খেতে চলে গিয়েছিল।

ঠিক সেই সময়, কতকগুলি বানর কোত্থেকে এসে সেই কাঠটা নিয়ে হুটোপুটি করতে লাগল। হুটোপুটি করতে করতে হঠাৎ একটা বানর সেই চেরা জায়গাটায় বসে কাঠের খিলটা নিয়ে টানাটানি শুরু করল। কাঠের খিলটা তো আলগাই ছিল। সেই টানাটানিতে হঠাৎ গেল খুলে। আর যাবে কোথায়! সেই বানরটার লেজটা গেল চেরা কাঠের ফাঁকে আটকে। ব্যস, তারপর পরিত্রাহী চিৎকার। ভয় পেয়ে অন্য বানরগুলি তো ততক্ষণে হাওয়া। আর এই বানরটা পড়ল ধরা। তারপর ছুতোর এসে তাকে পিটিয়ে ধরাশায়ী করল। তাই বলছিলাম, পরাধিকার চর্চা করতে গিয়েই না তার এই হাল হল।

"তহলেও।" দমনক বলল, "প্রভুর দিকে আমাদের নজর রাখা উচিত।"

"কেন?" করটক বলল, "নজর রাখবে তো প্রধানমন্ত্রী। তার উপরেই তো সব ভার দেওয়া আছে। আমাদের কি? আদার ব্যাপারী কেন জাহাজের খবর রাখব? তার ব্যাপারে আমাদের নাক গলানোই উচিত নয়। না হলে জানিস না—

যে প্রভুর মঙ্গলের জন্য পরের কর্তব্য করতে যায় সে যে গর্দভ চিৎকারের জন্য প্রহার খেয়েছিল তার মতই দুঃখভোগ করে।

"কি রকম?" দমনক বলল।

"তাহলে শোন।" করটক বলতে লাগল :

বহুদিন আগে বারাণসীতে কর্পূরপট নামে এক ধোপা ছিল। তার ছিল একটা গাধা এবং একটা কুকুর। কুকুরটা তার বাড়ি পাহারা দিত আর গাধাটা তার কাপড়ের মোট বইত।

একদিন গভীর রাত্রিতে তার বাড়িতে চোর এসেছে। ধোপা গভীর ঘুমে অচেতন। উঠানের এক কোণে খুঁটিতে বাধা গাধাটা কি কারণে তখনও ঘুমোয়নি। কুকুরটা বসে আছে তার পাশে। চোরটাকে দেখে গাধাটা চনমন করে উঠল। কিন্তু কুকুর একটা টুঁ শব্দ করল না। তা দেখে গাধা রেগে গিয়ে কুকুরকে বলল, "এই, কি করছিস? দেখছিস না চোর এসেছে। তুই চিৎকার করে প্রভুকে জাগিয়ে দে।"

"যা যা, মেলা ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিস না।" কুকুর নড়েচড়ে বসে বলল "তোর কাজ তুই কর। আমার কাজে মাথা গলাসনি।"

"না গলাবে না!" গাধা বলল, "তুই চোর দেখেও চিৎকার করবি না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?"

"হ্যাঁ দেখবি।" কুকুর বলল, "তুই কি জানিস না, দিনরাত আমি

প্রভুর বাড়ি পাহারা দিই। তাতে কি হয়েছে? তিনি নিরাপদে আছেন বলে আমার দিকে ফিরেও তাকান না। ভাল খাবারদাবারও পাই না। আরে, প্রভুর বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে কি আদর করেন? তুই-ই বল না।"

কুকুরের কথা শুনে গাধা গেল আরো রেগে। বলল, মূর্খ, তুই কি জানিস না—

যে ভৃত্য বা বন্ধু প্রভুর সঙ্কটের সময় অর্থ প্রার্থনা করে সে
কি রকম ভৃত্য বা সুহৃদ?"

গাধার কথা শুনে কুকুরও গেল রেগে। বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আর—
যে প্রভু কার্যকালে ভৃত্যকে সন্তুষ্ট করেন না, তিনিই বা
কিরকম প্রভু?"

গাধা বলল, "ছিঃ ছিঃ! পাপিষ্ঠ, প্রভুর বিপদের সময় কাজে অবহেলা? ছিঃ ছিঃ! থাকগে, আমারই জাগাতে হবে তাকে।" বলে গাধা চিৎকার করতে লাগল, হাক্কো, হাক্কো।

হঠাৎ গাধার চিৎকারে চোর তো থতমত খেয়ে লাগাল ছুট। আর এদিকে ধোপাও ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে এল ছুটে। ব্যাপার খানা কি?

গাধা তো তখন প্রভুকে দেখে আনন্দে আরও চিৎকার করতে লাগল—হাক্কো, হাক্কো।

রাতদুপুরে এই চিৎকার কার সহ্য হয়? ধোপা তো গাধাটা পাগলা হয়ে গেছে ভেবে একটা লাঠি এনে চিৎকার করে উঠল, "পাজি, রাতদুপুরে তোমার আনন্দ হয়েছে? দাঁড়াও—!" বলে গাধাকে কি ঠ্যাঙানি, কি ঠ্যাঙানি। তাই বলছিলাম—" করটক বলল, "আমাদের কি দরকার পরাধিকার চর্চার? আমাদের খাবার তো আছেই।"

"কি কি বললি?" দমনক রেগে উঠল। "তুই খাবারের জন্য প্রভুর সেবা করিস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আরে—

যিনি জীবিত থাকলে ব্রাহ্মণ, মিত্র ও আত্মীয়গণ জীবিত

থাকেন তার জীবনই সার্থক। নিজের জন্য কে না বেঁচে
থাকে ?

অর্থাৎ বুঝতে পারছিস না—

যিনি জীবিত থাকলে বহুলোক বেঁচে থাকে তারই তো
বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কাক ঠোঁট দিয়ে নিজের উদর
পূরণ করে না ?

প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে জানি, কিন্তু ভৃত্যের মধ্যে ?
জানিস না—

কুকুর তার অন্নদাতার কাছে লেজ নেড়ে, পায়ে পড়ে, মাটিতে
লুটিয়ে পড়ে প্রভুর অনাদর দর্শন করে; কিন্তু হাতি, সে
ধীরভাবে দেখে প্রভুর মিষ্টি কথায় খায়।

আরে, উন্নতি অবনতি তো নিজের উপরই নির্ভর করে যেমন—

মানুষ নিজের কর্ম অনুসারে কূপ খননকারীর মত ক্রমশ
নিচের দিকে যায়, আবার কর্ম অনুযায়ীই প্রাচীর নির্মাণ-
কারীর মত উপরের দিকে ওঠে ”

করটক বলল, “আচ্ছা, তাহলে তুই কি বলছিস ?”

দমনক বলল, “বলব আবার কি ? জল খেতে গিয়ে ভয় পেয়ে
প্রভু এসে বসে আছেন।”

“তাই নাকি ?” করটক বলল, “কি করে বুঝলি ?”

“বুঝব না কেন ?” দমনক বলল, “বুদ্ধিমান মানুষের কাছে
বোঝারবাকি থাকে কি ?

জানিস না—

যেখানে বায়ু এবং সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না
সেখানেও পণ্ডিতের বুদ্ধি সর্বদা প্রবেশ করতে পারে।

আরে—

বলে দিলে পশুরাও তো বুঝতে পারে। চালকের আদেশেই
তো হাতি-ঘোড়া ভার বহন করে। না বললেও বিদ্বান পুরুষ

অনুক্ত বিষয় বুঝতে পারেন। অন্যের মনোগত ভাব বুঝতে পারাই তো বুদ্ধি।"

"হুঁ।" করটক বলল, "বুঝেছি। তুই সেবাকাজে অনভিজ্ঞ"

"কেন, কেন?" দমনক বলল, "অনভিজ্ঞ কেন?"

"আরে তুই অসময়ে প্রভুর কাছে গেলে গালাগালি করবে না?"

"তা হোক। তবুও যাব। প্রভুর কাছে যাওয়া উচিত। কারণ—

ক্ষতির আশঙ্কায় কাজ আরম্ভ না করা কাপুরুষের লক্ষণ।
অজীর্ণের ভয়ে, ভাই, কেউ কি খাওয়া ত্যাগ করে?"

করটক বলল, "গিয়ে কি বলবি?"

"বলব আবার কি?" দমনক বলল, "আগে দেখব প্রভু আমার উপর বিরক্ত না অনুরক্ত।"

"কি করে বুঝবি?" করটক বলল।

"আরে—।" দমনক বলল—

'দূর থেকে দেখা, হাসা, কুশল জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত আদর
প্রকাশ করা, অসাক্ষাতে গুণের প্রশংসা করা, প্রিয়বস্তু পেলে
স্মরণ করা, তার সেবকদের প্রতি অনুরক্তি দেখান, দান করা,
সন্তোষ বর্ধন করা, দোষ করলেও গুণ গ্রহণ করা
এতগুলিই হল ভৃত্যের প্রতি অনুরক্তির লক্ষণ। আর—

কালক্ষেপ করা, আশা বাড়িয়ে দেওয়া, প্রাপ্য বস্তু না দেওয়া
বুদ্ধিমান মানুষ এগুলি বিরক্তির চিহ্ন বলে জানবেন।"

করটক বলল, "তবুও প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে তোর কিছু বলা উচিত নয়।"

দমনক বলল, "আরে না না, ভয় নেই। অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলব না। আরে উপযুক্ত সময়েও যদি কিছু মন্ত্রণা না দিতে পারি তবে আমার মন্ত্রিপদে থাকাই বৃথা। বুঝলি, আমি যাচ্ছি।"

করটক মাথা চুলকে বলল, "তা—তা যাচ্ছিস যা, আয়।"

তারপর দমনক তো সিংহের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে সিংহ যেন একটু আশ্বস্ত হল। বলল, "আরে, দমনক যে! কি খবর? এস, এস।"

দমনক বলল, "আজ্ঞে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে এসেছি। যদিও জানি, আমার মত ভৃত্যের আপনার প্রয়োজন নেই, তবুও ভাবলাম আপনার প্রয়োজনের সময় আমার আসা উচিত।"

সিংহ বলল "হুঁম্, আমিও ভাবছিলাম—বহুদিন আসনি—তা বল তোমার কথা—নির্ভয়ে বল।"

"আজ্ঞে—।" দমনক বলল, "আমি দেখলাম আপনি জল খেতে গিয়ে জল না খেয়েই দৌড়ে এসে বসে আছেন। তাই ভাবলাম—।" বলে সে একটু চুপ করে রইল।

সিংহ তো ভয়ে তখনও কাঁপছিল, তার কথায় যেন ধড়ে প্রাণ এল। বলল, "তা ভাল মনে করেছ। কি জান, তুমি আমার মন্ত্রিপুত্র আর একজন মন্ত্রিও বটে। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই। তা আমি একটু ভয়ই পেয়েছি।"

"ভয়!" দমনক যেন বিস্মিত হল। বলল, "প্রভু আপনি—।"

দমনকের কথার উপরেই কথা বলে উঠল সিংহ। বলল, "না, না, তুমি বুঝতে পারছ না। জল খেতে গিয়েই তো শুনলাম গর্জনটা, প্রচণ্ড। যার গর্জন এমন সে দেখতে না জানি কেমন। তুমিও আশা করি শুনেছ। তাই ভাবলাম, এখান থেকে চলেই যাব।"

সিংহের কথা শুনে দমনক মনে মনে এক চোট হেসে বলল, "প্রভু, আমিও শুনেছি। কিন্তু কারণটা না জেনে যাওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? তাই বলছিলাম, এক কাজ করি। কারণটা জেনে নিয়ে একটা ব্যবস্থা করি—আমি ও করটক—।"

"করটক?"

"হ্যাঁ প্রভু, আপনার আর এক মন্ত্রী। একসঙ্গেই তো কাজ

করি আমরা। আমি ডেকে আনছি প্রভু।" বলে সে ছুটে গিয়ে করটককে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

সিংহ বলল, "তা—তোমরা পারবে বলছ?"

"হ্যাঁ প্রভু।" দমনক বলল, "আপনি নির্ভয়ে থাকুন। যদি না পারি তখন নয়ত চলে যাব।"

"বেশ, তাহলে এস।" বলে সিংহ তাদের দুজনকেই প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে বিদায় করল।

করটকের কিন্তু দমনকের এই ভাব খুব ভাল লাগল না। বলল, "দমনক, তুই পারবি কি পারবি না এটা না জেনেই ঝট করে পারব বলে চলে এলি। এটা কি ভাল হল? তাছাড়া এতগুলি পারিতোষিক নিয়ে এলি।"

দমনক বলল, "বন্ধু, ঠিক পারব। তুই চুপ করে বসে দেখ। আরে, গর্জনটা একটা ষাঁড়ের। ষাঁড় তো আমরাই খাই। জানলে কি প্রভু তাকে ভয় করেন?"

"তাহলে তুই বলে দিলি না কেন?" করটক বলল।

"তুইও যেমন।" দমনক বলল, "তাহলে এতগুলি পারিতোষিক পেতিস? আরে, শাস্ত্রেই তো আছে—

প্রভুকে ভৃত্য কখনও প্রয়োজনবোধশূন্য করবে না। প্রভুকে প্রয়োজনবোধশূন্য করলে ভৃত্য দধিকর্ণ নামক বিড়ালের মত বিপন্ন হয়।"

"কি রকম?" করটক জিজ্ঞেস করল।

"তাহলে শোন—।" দমনক বলতে লাগল—

উত্তর দিকে অর্বুদশিখর নামে এক পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ বাস করত। সে নামেও যেমন দুর্দান্ত, কাজেও সে তেমনই পরাক্রমশালী। কিন্তু পরাক্রম থাকলে কি হবে? তার গুহাতে একবার খুব ইঁদুরের উৎপাত হয়। রাত্রে সে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। ঘুমোলেই ইঁদুর তার কেশর কেটে নেয়। অতিষ্ঠ হয়ে সে দুয়েকদিন ধরতে চেষ্টা করেছে ইঁদুরকে। কিন্তু ছোট ইঁদুরকে কি আর সে ধরতে পারে? চট করে গর্তে লুকিয়ে পড়ে। মহা জ্বালাতন হয়ে একদিন সিংহ ভাবতে লাগল, কি করা যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল—

> ক্ষুদ্র শত্রুকে বিক্রম দ্বারা লাভ করা যায় না। তাকে বিনাশ
> করতে হলে তার মতই সৈনিক নিয়োগ করা দরকার।

এসব ভেবে সে করল কি, তার পরদিন এক গ্রাম থেকে দধিকর্ণ নামে একটি বিড়ালকে এনে গুহাতে রেখে দিল। খুব আদরযত্ন করে সে তাকে খেতেও দেয়। আর বিড়াল মহানন্দে গুহা পাহারা দেয়।

এদিকে ইঁদুরের হয়েছে মহাজ্বালা। সে এখন সিংহের কেশর কাটবে কি? খাবারের জন্য গর্তের বাইরেই যেতে পারে না বিড়ালের ভয়। আর এদিকে সিংহ ইঁদুরের ছুটোপাটি শোনে বটে, কিন্তু কেশর যেমন তেমনই থাকে। মনের আনন্দে ঘুমোয়।

একদিন খিধের জ্বালায় ইঁদুর যেই তার গর্ত থেকে বেরিয়েছে বিড়াল তো তক্ষুনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে খেয়ে ফেলল। ব্যস, ইঁদুরের ভবলীলা শেষ। সিংহ এখন নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

তারপর দিন যায়। সিংহ যখন দেখল ইঁদুরের আর উৎপাত নেই তখন সে বিড়ালকে আর আগের মত আদর করে না, খাবার দেয় না। তাতে বিড়ালের আর কষ্টের সীমা নেই। সে দিনদিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

"তাই বলছিলাম—"দমনক বলতে লাগল, "বিড়ালের বিপন্ন হওয়ার কথা। যাকগে চল যাই ষাঁড়টার কাছে।" বলে সে করটককে নিয়ে একটা গাছতলায় বসিয়ে সোজা চলে গেল ষাঁড়ের কাছে। ষাঁড়টা তখন আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল। দমনক কাছে যেতেই সে মুখ তুলে তাকাল

দমনক বলল, "কি হে, তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? আমাদের রাজার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছ? ভাল চাও তো শিগগির আমাদের সেনাপতির কাছে যাও। নাহলে দূর হয়ে যাও বন থেকে।"

ঘাবড়ে গিয়ে ষাঁড় বলল, "আজ্ঞে—।"

"না না, আজ্ঞে-টাজ্ঞে না।" দমনক বলল, "প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে কি করে ফেলবেন জানি না। যাও, যাও শিগগির।"

ঘাস খাওয়া তখন সঞ্জীবকের মাথায় উঠে গেছে। সে তাড়াতাড়ি করটকের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বলল, "আজ্ঞে, সেনাপতি মশায়, আমি কি করব?"

"হুম্।" করটক একটা হাই তুলে বলল, "তুমি এক কাজ কর, আমাদের রাজাকে গিয়ে প্রণাম কর।"

"আজ্ঞে—" সঞ্জীবক বলল, "যদি অভয় দেন, তবে—।"

"না না," করটক বলল, "ভয়ের কিছু নেই। তুমি কি জান না—

প্রবলবায়ু কোমল, ক্ষুদ্র ও সর্বপ্রকারের নিচু তৃণকে উৎপাটিত করে না। উন্নত বৃক্ষকেই ভাঙে বা উৎপাটিত করে। প্রবল প্রবলের প্রতিই শৌর্য প্রদর্শন করে।

যাকগে, চল।" বলে দমনক ও করটক সঞ্জীবককে নিয়ে চলল রাজার কাছে। ডেরার কাছে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে সঞ্জীবককে রেখে তারা দুজনে ঢুকে গেল গুহায়।

রাজা তো তাদের দেখেই বলল, "আরে, আরে, এস এস। তারপর কি খবর? সেই প্রাণীটার দেখা পেলে?"

"হ্যাঁ মহারাজ," দমনক বলল, "আপনি যেমন বলেছিলেন, গর্জনও যেমন প্রচণ্ড দেখতেও তেমনি ভয়ঙ্কর। তাকে নিয়ে এসেছি এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে।"

"অ্যাঁ," বলে হাত-পা এলিয়ে দিল সিংহ। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। কথায় আছে না—

জলের বেগে আপনিই বাঁধ ভেঙে যায়, গোপন না রাখলে মন্ত্রগুপ্তিও প্রকাশ হয়ে যায়, খলতায় প্রণয় নষ্ট হয় আর কথায় লঘুচিত্তকে বশ করা যায়।

সিংহের হয়েছে তাই। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "তা-তাহলে তুমি বলছ, সে এ-খা-নে আছে?

দমনক কিন্তু ঠিক লক্ষ্য করেছিল সিংহের ভাব। সে বলল, "না মহারাজ ভয়ের কিছু নেই। আপনি ঠিক হয়ে বসুন। আপনি কি জানেন না—

শব্দের কারণ না জেনে কেবল শব্দ শুনেই ভয় করা উচিত নয়। শব্দের কারণ জেনেই না এক দূতী রাজ সম্মান লাভ করেছিল।"

"তাই নাকি?" রাজা বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন মহারাজ।" বলে দমনক বলতে লাগল:

শ্রীপর্বতে ব্রহ্মপুর নামে একটি নগর ছিল। লোকে বলে সেই পর্বতের চূড়ায় ঘণ্টাকর্ণ নামে নাকি এক রাক্ষস বাস করত।

তা সত্যি মিথ্যে যাই হোক, একদিন এক চোর এক ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে একটা ঘণ্টা চুরি করে। চুরি করে সে গোপনে সেই পর্বতের চূড়ার কাছ দিয়ে একটা পথে যাচ্ছিল। পথে এক বাঘ এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খেয়ে ফেলে।

এদিকে হয়েছে কি, সেই পর্বতে কতগুলি বানর বাস করত। তারা একদিন সেই ঘণ্টাটা পেয়ে খুব খুশি। টিং টিং করে ঘণ্টা বাজায় আর নাচে।

পাহাড়ী জায়গা তো, চারদিকে খুব নীরব। সেই ঘণ্টার টিং টিং শব্দ নগরের লোকেরাও শুনতে পেত। এদিকে মাঝে মাঝেই তো কাঠুরিয়ারা পর্বতে কাঠ কাটতে যেত। তারা একদিন বাঘের খাওয়া এক পথিকের দেহ দেখতে পেয়ে ভাবল নিশ্চয় রাক্ষসই তাকে খেয়েছে। একটু পরে দূর থেকে সেই ঘণ্টার শব্দ শুনে ভাবল এটাও নিশ্চয় রাক্ষসই বাজাচ্ছে।

তারপর থেকে তারা যখনই ঘণ্টার শব্দ শোনে তখনই ভাবত

রাক্ষসই মানুষ খাচ্ছে আর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। তারপর সেই নগরের প্রজারা ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে লাগল।

রাজা পড়লেন মহা বিপদে। প্রজারাই যদি চলে যায় তবে কাকে নিয়ে রাজত্ব করবেন তিনি। তখন রাজার করালা নামে এক বিশ্বাসী দূতী ভাবল রাক্ষস যদি মানুষ খায়ই তবে সে ঘণ্টা বাজাবে কেন? তাহলে মানুষ তো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তাছাড়া এই পর্বতে যে রাক্ষস আছে তারও তো কোন প্রমাণ নেই। তাই সে খোঁজ করে দেখল এগুলি বানরের কাজ।

তারপর সে রাজার কাছে গিয়ে অভয় দিয়ে বলল, "মহারাজ যদি অনুমতি করেন তবে আমি ঘণ্টাকর্ণকে বশীভূত করতে পারি। তবে সামান্য অর্থব্যয় করতে হবে আপনাকে।"

তার কথা শুনে রাজা তো খুব খুশি। তাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে বললেন— "তুমি যদি রাক্ষসকে বশীভূত করতে পার তোমাকে যথেষ্ট ধনদৌলতে দেওয়া হবে।"

তারপর সেই দূতী একদিন অনেক কলা কিনে পর্বতের এক জায়গায় ছড়িয়ে রেখে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। বানরগুলি তো অতশত জানে না। তারা একটু পরে এসে ঘণ্টাটা মাটিতে ফেলে কলাগুলি খেতে খেতে চলে গেল।

আড়াল থেকে দূতী তো সবই দেখেছে। সে তখন বেরিয়ে এসে ঘণ্টাটা নিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা তো খুব খুশি। বখশিসও করল সেরকম। প্রজারা তো আনন্দে আত্মহারা। রাক্ষসের আর ভয় নেই। তারপরে সে যা সম্মান পেল তা আর কি বলব। সেজন্যই বলেছিলাম শব্দের কারণ না জেনেই ভয় তো সবাই ভয় পেয়েছিল।

সে যা হোক, তারপর দমনক ও করটক তো সঞ্জীবককে নিয়ে এল সিংহের কাছে। প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও সিংহ যখন দেখল এ একটা বলদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন সে একটু আশ্বস্ত হল। তবে সে

সঞ্জীবককে তখনই খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু সে ভাবল, না এতবড় প্রাণীটাকে না খেয়ে যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি তবে ভবিষ্যতে অনেক উপকার হতে পারে। তাই সে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একসঙ্গে বাস করতে লাগল।

দিন যায়। একদিন স্তব্ধকর্ণ নামে সিংহের এক ভাই এল পিঙ্গলকের সঙ্গে দেখা করতে। পিঙ্গলক মহা খুশি হয়ে ভাইকে আদর আপ্যায়নের পর প্রচুর প্রাণী হত্যা করে তাকে খেতে দিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তারা বসে কথা বলছে এমন সময় সঞ্জীবক এসে পিঙ্গলককে বলল, "প্রভু, আজ যে এতগুলি জন্তু হত্যা করা হয়েছে তার মাংস গেল কোথায়?"

পিঙ্গলক হেসে বলল, "এর উত্তর দমনক ও করকট জানে।"

"তারা দুজনে এত মাংস খেয়েছে?" সঞ্জীবক বলল।

"না না," পশুরাজ বলল, "এত মাংস কি আর খেতে পেরেছে। কিছু খেয়েছে, কিছু নষ্ট করেছে। রোজই তো তারা এরকম করে।"

"সে কি! আপনার অজ্ঞাতসারে তারা এরকম করে?"

"হ্যাঁ, তারা এরকমই করে।"

"না, না, এ তো ভাল কথা নয়।" সঞ্জীবক বলল, "কথাতেই তো আছে—

বিপদ নিবারণ ছাড়া রাজার কাছে না বলে কোন কাজ
নিজের ইচ্ছানুসারে করা উচিত নয়।
যে অমাত্য এক কপর্দকও বৃদ্ধি করতে সক্ষম সেই শ্রেষ্ঠ।
ধনশালী ভূপতির ধনই প্রাণ, অন্য কিছু নয়। আর,
যিনি আয়ের কথা বিবেচনা না করে যথেচ্ছাচার করেন
তিনি কুবেরের মত ধনশালী হলেও শীঘ্রই ভিক্ষুকের মত
দরিদ্র হয়ে পড়েন।"

স্তব্ধকর্ণ বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ সঞ্জীবক। দমনক ও করটক তো যুদ্ধের কাজেই নিযুক্ত। তাদের কেন মাংস মানে ধনের কাজে

নিয়োগ করেছ ? কাকে কি কাজে নিয়োগ করবে জান না ? শাস্ত্রেই তো আছে—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আত্মীয় স্বজনকে ধনাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা উচিত নয় ব্যয় করবার জন্য রাজার অনুমতিপ্রাপ্ত অর্থও ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে দান করেন না।

ধন রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ক্ষত্রিয় নিশ্চয় খড়্গ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ উৎকোচদানে লোককে বশীভূত করে রাজ্যলাভে অগ্রসর হন) জ্ঞাতিবর্গের মত আত্মীয় অধিকার করে সব অর্থ গ্রাস করে।

সকলপ্রকার অমাত্যই, উত্তম, মধ্যম ও অধম, ধনশালী হলে রাজার বশে থাকে না। ঐশ্বর্যই চিত্তবিকার ঘটায়, এ সিদ্ধপুরুষদেরই উপদেশ।

প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করা, বহুমূল্য দ্রব্য পরিবর্তন করে অল্পমূল্যের দ্রব্য রেখে দেওয়া, ন্যায়বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা, রাজার কার্য উপেক্ষা করা, অভিভাবকের মত কাজ করা, ভোগবিলাসে আসক্তি মন্ত্রীর দোষ।

কর্মচারিগণের ধনাগমে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, সর্বদা রাজাকে পরীক্ষা করা, অধীনস্থকে প্রশ্রয় দেওয়া ও কর্তব্য কর্মে উপেক্ষাও মন্ত্রীর দোষ।

ন্যায়হীন ধনগ্রহণকারী কর্মচারীদের বারবার পীড়ন করা রাজার কর্তব্য। স্নানবস্ত্র একবার নিংড়ালেই কি সব জল বের হয় ?

"যাকগে যা বললাম—," স্তব্ধকর্ণ বলল এখন বুঝে দেখ।"

পিঙ্গলক বলল, "যা বলেছ ঠিকই বলেছ, কিন্তু দমনক ও করটক আমার কোন কথাই শোনে না।"

স্তব্ধকর্ণ বলল, "না না, এ তো ঠিক নয়। কথায়ই তো আছে—

নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির যশ নষ্ট হয়, খলের নষ্ট হয় মৈত্র, চরিত্রহীনের

কুল, অর্থলোভীর ধর্ম, দ্যুতক্রীড়াসক্তের নষ্ট হয় শাস্ত্রজ্ঞান,
কৃপনের সুখ, আর মত্ত মন্ত্রীর জন্য নষ্ট হয় রাজ্য।
চোর, কর্মচারী, রাজার প্রিয়জন ও নিজের লোভ থেকে
রাজা প্রজাকে পিতার ন্যায় নিশ্চয়ই প্রতিপালন করবেন।
ভাই, যা বললাম তা কর দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি সঞ্জীবককে খাদ্য রক্ষার কাজে নিয়োগ কর।" বলে স্তব্ধকর্ণ চুপ করল।

পিঙ্গলকও ভাইয়ের পরামর্শ মতই সঞ্জীবককে সব ভার দিয়ে দুজনে বন্ধুর মত কাল কাটাতে লাগল।

দিন যায়। করটক ও দমনক পড়ল মুশকিলে। খাবার দাবারও জোটে না।

একদিন দমনক করটককে ডেকে বলল, "বন্ধু কি করা যায় বল দেখি? এ তো আমাদের নিজেদেরই দোষ। এই তো দেখ না—

কন্দর্পকেতু নামে এক পরিব্রাজক স্বর্ণরেখা নামে কোন এক বিদ্যাধরীর ছবি স্পর্শ করে, এক দূতী নিজেকে দড়িতে বেঁধে এবং এক সাধু মণি নিতে গিয়ে নিজের দোষেই না কষ্ট ভোগ করেছিলেন।"

করটক বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শোন!" দমনক বলতে লাগল :

কাঞ্চনপুর নামক নগরে বীর বিক্রম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। একদিন রাজ্যের বিচারক ও অন্যান্য রাজপুরুষের সঙ্গে তিনি এক নাপিতকে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পথের মধ্যে কন্দর্পকেতু নামে এক পরিব্রাজক এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন, "করছেন কি ? একে বধ করা উচিত নয়।"

"কেন, কেন ? একথা বলছেন কেন ?" বলে বিচারক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"তাহলে শুনুন।" বলে পরিব্রাজক বলতে লাগল—

"আমি সিংহলের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র কন্দর্পকেতু। আমি একবার এক বণিকের কাছে শুনেছিলাম যে সমুদ্রের মধ্যে চতুর্দশী তিথিতে এক কল্পবৃক্ষের আবির্ভাব হয়েছে। তার নিচে নাকি রত্নালঙ্কারে-ভূষিতা এক অতি সুন্দরী কন্যা এক খাটের উপর বসে বীণা বাজায়। একথা শুনে তো আমার খুব ইচ্ছা হল নিজে গিয়ে দেখি। গেলামও। পৌঁছে দেখলাম যা শুনেছি তাই। দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। ঝপাং করে জলে দিলাম লাফ। আর তারপরে সটান গিয়ে উঠলাম সেই সুবর্ণপুরীতে।

আমি যেমন সেই সুন্দরীকে দেখেছিলাম সেও কিন্তু দেখেছিল আমাকে। সে তার একজন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে নিয়ে যেতে। তার কাছেই শুনেছিলাম এই সুন্দরী কন্যার নাম রত্নমঞ্জরী, বিদ্যাধর-রাজ কন্দর্পকেলির কন্যা। তাঁর প্রতিজ্ঞা যিনি সশরীরে এসে সুবর্ণপুরী সচক্ষে দেখবেন তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। আমি যখন এসেছি তখন আমিই তো তাকে বিয়ে করতে পারি। বিয়ের প্রস্তাবে আমি তো খুব খুশি। তারপর তাকে বিয়ে করে সুখে কাল কাটাতে লাগলাম।

একদিন সে আমাকে বলল, "প্রভু, আপনি নিজের ইচ্ছামত এই প্রাসাদের সব উপভোগ করতে পারবেন, একটা জিনিস ছাড়া।"

"কি সেটা?" আমি বললাম।

সে তখন আমাকে প্রাসাদের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি অতি সুন্দরী এক রমণীর ছবি দেখিয়ে বলল, "এই ছবিটা আপনি দূর থেকে দেখবেন কিন্তু স্পর্শ করবেন না কখনও।"

কেন যে সে একথা বলল কিছুই বুঝলাম না। তাই কৌতূহলও দমন করতে পারলাম না। একদিন গোপনে গিয়ে যেই না স্পর্শ করেছি ছবিটা দেখি কি—। বলে পরিব্রাজক চুপ করে গেলে বিচারক বলে উঠলেন, "কি হল? কি দেখলেন আপনি?"

পরিব্রাজক বললেন, "সে আমার দুঃখের কথা। দেখি, কোথায় কি? কোথায় গেল সুবর্ণনগরী, কোথায়ই বা গেল আমার স্ত্রী, আমি অচেতন হয়ে পড়ে আছি আমারই নিজের রাজ্যে। দুঃখের ভোগ পেতে হল আমায়। আমি ভ্রমণ করতে করতেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানেও এক কাণ্ড। গতকাল সন্ধেবেলায় যখন উপস্থিত হলাম এখানে তখন আমি কোথায় যাব, কি করব, কিছুই ঠিক নেই।

ঘুরতে ঘুরতে যাহোক এক যোগগৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ কার কথায় আমার ঘুম ভেঙে

গেল। তাকিয়ে দেখি এক গোপিণী এক নাপতানির সঙ্গে কথা বলছে। এমন সময় হঠাৎ গোপ আসতেই নাপতানি ছুটে পালিয়ে গেল। তারপরেই লাগল গোপ ও গোপিণীতে ঝগড়া। ঝগড়াটা যে কি নিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি গোপ গোপিণীকে একটা স্তম্ভেতে বেঁধে চলে গেল শুতে।

আমার ঘরটা এমন জায়গাতে ছিল যে একটা জানালা দিয়ে সবই দেখা যায়। আমি তো হতভম্ব। কি যে হয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না। ঘুমও আর এল না আমার। তবু একসময় চোখ বুজেই এসেছিল হঠাৎ কিসের শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি আবার এসেছে সেই নাপতানি। আমিও কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। ভাবলাম শুনতেই হবে তারা কি বলে। তখনই জানলাম নাপতানিই বা কেন এসেছে, আর গোপের সঙ্গে ঝগড়াই বা হয়েছে কেন গোপিণীর।

আসলে হয়েছিল কি তাকে গোপিণীর বিয়ের আগে একজন ভালবাসত। তারপর গোপিণীর বিয়ে হয়ে গেলে সে মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সে এখানে এসেছে এবং গোপিণীকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। তাই সে নাপতানিকে দূতী হিসেবে গোপিণীর কাছে পাঠিয়েছিল যেন সে একবার তার সঙ্গে দেখা করে। গোপ এসে এই কথাটা শুনেই শাস্তি দিয়েছিল।

যাহোক নাপতানি তো আবার এসে গোপীণীকে বাঁধা দেখে খুব দুঃখ করে বলল, "বউ, একবার না হয় তার সঙ্গে দেখা করেই এস। তোমার জায়গায় আমাকেই না হয় বেঁধে যাও। তাহলে রাত্রের অন্ধকারে গোপ আমাকে চিনতে পারবে না। পরে তুমি এসে আমাকে ছেড়ে দিও।"

"কিন্তু আমার যে ভয় করছে।" গোপিনী বলল।

"অত ভয় করলে কি চলে বউ? এস।" বলে নাপতানি

গোপিণীকে ছেড়ে দিলে গোপিণী তাকে সেই স্তম্ভেতে বেঁধে রেখে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গোপের হয়ত দয়া হয়েছিল তার স্ত্রীর কথা ভেবে। তাই সে অন্ধকারেই স্তম্ভের কাছে এসে নাপতানিকে তার স্ত্রী ভেবে বলল, "কি আর যাবে না তো তার কাছে ?"

এদিকে নাপতানি তো ভয়ে কাঁপছিল। ধরা না পড়ে যাওয়ার জন্য সে চুপ করেই রইল।

তাতে গোপ গেল রেগে। বলল, "কি এত সাহস ? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না ? দাঁড়াও।" বলে সে একটা ছুরি এনে নাপতানির নাক কেটে চলে গেল।

নাকের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল নাপতানি। তার খানিক পরে গোপিণী এসে নাপতানির এ অবস্থা দেখে দুঃখ করে বলল, "বোন আমার জন্য তোর এ দশা।" বলে খানিক কান্নাকাটি করে সে নাপতানিকে ছেড়ে দিল। নাপতানিও তারপর তাকে স্তম্ভেতে বেঁধে চলে গেল বাড়িতে।

নাপতানির গেরো কাটেনি তখনও। নাপিত তার পরদিন ভোরবেলার ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে সে ফিরে দাঁড়িয়ে নাপতানিকে বলল, "বউ আমাকে একটা ক্ষুরপাত্র দাও দেখি।"

কি শুনতে কি শুনল নাপতানি, নাকের যন্ত্রণায় জ্বলছিল তো, সে ক্ষুরপাত্র না দিয়ে ভুলে একটা ক্ষুরই বাড়িয়ে ধরল নাপিতের দিকে।

একে দেরি হয়ে গিয়েছিল নাপিতের, তার ওপর ক্ষুরটা দেখে সে গেল রেগে। বলল, "কি ? চাইলাম ক্ষুরপাত্র দিলি ক্ষুর ? তবে এই দেখ—।" বলে সে ক্ষুরটা ছুঁড়ে মারল নাপতানির দিকে।

ব্যস, লেগে গেল দুজনের মধ্যে ঝগড়া। নাপতানি এতক্ষণ ঘোমটা টেনেই বসেছিল, নাপিত তো তার কাটা নাক দেখেনি। সেও

কম চালাক নয়। এইবার ঘোমটা সরিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল —হায়, হায় রে! নাপিত ক্ষুর দিয়ে আমার নাক কেটে দিয়েছে। পরিত্রাহী চিৎকার। নাপিত গেল ঘাবড়ে। ততক্ষণে পাড়াপড়শী সব এসে হাজির। তারা নাপিতের কোন কথাই শুনল না। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বিচারকদের হাতে তুলে দিল। ঐ তো সেই নাপিত যাকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা।

আর এদিকে গোপের বাড়িতে আরেক কাণ্ড। নাপতানির নাক কেটে গোপ চলে গিয়েছিল। সে তো আর জানে না যে সে স্ত্রীর নাক কাটেনি, কেটেছে নাপতানির। সে ভেবেছিল তার স্ত্রীর নাকই সে কেটেছে। তা শত হলেও তারই স্ত্রী, একটু দয়াও হয়েছিল রাগ পড়ে যেতে। তখনও অন্ধকার কাটেনি। গোপ সেই অন্ধকারেই গোপীণীর কাছে এসে বলল, "কি, কাটা নাকের কথা মনে থাকবে? শাস্তি হল তো!"

চিৎকার করেউঠল গোপিণী —"পাপিষ্ঠ, আমি মহাসতী! কে আমার নাক কাটতে পারে? যদি আমি সতী হয়ে থাকি, তবে কাটা নাক তক্ষুনি জোড়া লাগবে। তুমি আলো নিয়ে এসে দেখ।"

কথা শুনে গোপও গেল রেগে। "কি, এতবড় কথা? দেখি তো—।" বলে গোপ তক্ষুনি বাতি নিয়ে এল একটা। আর এসেই দেখল কোথায় কি! গোপিণীর নাক দিব্যি আছে। সে তখন স্ত্রীর পায় পড়ে বলল, "তাই তো, আমিই তো পাপ করেছি। তুমি সতী, আমি পক্ষ।

আর ঐ যে সাধু দেখছেন, তিনি বার বৎসর মলয় পর্বতে থেকে এই নগরে এসেছেন। এই নগরের কিছুই চেনেন না। তাই তিনি না জেনে এক ঠগিনীর আশ্রয়ে রাত কাটাতে গিয়ে পড়েছেন বিপদে। সেই ঠগিনীর বাড়ির দরজায় একটা কাঠের মূর্তি ছিল,— তার মাথায় ছিল একটি রত্ন। এই রত্নের লোভ দেখিয়েই সে লোক ঠকাত।

সাধু যখন এই ঠগিনীর বাড়িতে আশ্রয় নেন তখন তিনিও এই রত্নটা দেখেছিলেন। সাধু হলেও মানুষই তো, তিনিও রত্নটার লোভ সামলাতে পারে নি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি রত্নের লোভে যেই না হাত বাড়িয়েছে মূর্তিটার মাথায়. তক্ষুনি চটাস করে দুটি হাত এসে জাপটে ধরল তাকে। সাধু পড়লেন মুশকিলে, নিজেকে ছাড়াতে পারেন না। চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তার চিৎকার শুনে ঠগিনী বেরিয়ে এসে ধরল সাধুকে। বলল, "আপনি তো মলয় পর্বত থেকেই এসেছেন, কিছু টাকাকড়ি নিশ্চয়ই আছে আপনার। এই মূর্তি বেতাল। একে টাকাকড়ি না দিলে এ ছাড়বে না আপনাকে। বের করুন কি আছে আপনার।

সাধু আর কি করেন। তার টাকাকড়ি যা ছিল তা ঠগিনীর হাতে তুলে দিয়ে মুক্তিলাভ করলেন তিনি। বলেই পরিব্রাজক বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জিজ্ঞেস করুন না সাধুকে, আমি ভুল বলেছি কিনা।"

বিচারক সব শুনে আবার নতুন করে বিচার করে নাপতানির মাথা মুড়িয়ে গোপিণীকে শাসন করে ঠগিনীকে শাস্তি দিয়ে সাধুর সব টাকাকড়ি ফিরিয়ে দিলেন।

"তাই বলছিলাম—"দমনক বলল, "এরা সব নিজের দোষেই তো কষ্ট পেল। কাজেই দোষ যখন আমরাই করেছি বিলাপ করে আর কি হবে?" "তাহলে কি করবি?" করটক বলল।

"করব আবার কি?" দমনক বলল, "ভেদ ঘটাব। ওদের দুজনের মধ্যে তো খুব ভাব—যেমন বন্ধুত্ব ঘটিয়েছি তেমন ভেদ ঘটাব। আমার বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? আরে—

উপস্থিত কার্যে যার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, সে মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পায়। যেমন গোপিণী দুজন থেকে উদ্ধার পেয়েছিল।"

"গোপিণী উদ্ধার পেয়েছিল? করটক বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শোন।" দমনক বলতে লাগল:

দ্বারবতী নামে এক নগরে এক গোপ তার তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। গোপের স্ত্রী গোপিণী দেখতে যেমন সুন্দরী কথাবার্তাতেও ছিল খুব মিষ্টভাষী। পাড়াপড়শীর সঙ্গে তার খুবই সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে তার সৌন্দর্যই হয়ে উঠল কাল।

তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেই নগরের কোটাল প্রায়ই গোপের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি এসে তাকে বিরক্ত করত। সে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছিল না ভয়ে। শত হলেও তো কোটাল, কি থেকে সে কি করে বসে, সেই ভয়ে সে গোপকেও তার সম্বন্ধে কিছু বলেনি। এদিকে আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া, কোটালের ছেলেও এসে মাঝে মাঝে তাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করল।

গোপিণী এমনিতে ছিল খুব নিরীহ। সে ইচ্ছে করলে বাপের কাছে ছেলের কথা বলে দিতে পারত, কিন্তু যদি কোটাল তার ছেলেকে শাস্তি দেয়, এই ভয়ে সে কোটালকে তার ছেলের সম্বন্ধে কিছু বলেনি। মারামারি তার ভাল লাগত না। কিন্তু তাদের বাপবেটার উৎপাতও তো বন্ধ না করলে নয়, কি করবে সে বুঝে উঠতে পারল না। তাছাড়া গোপ শুনলেই বা কি বলবে? ভয়ে ভয়েই সে দিন কাটায়।

একদিন হয়েছে কি, গোপ বাড়ি নেই দেখে কোটালের ছেলে জোর করে বাড়িতে ঢুকে তাদের বসবার ঘরে গিয়ে বসল। বসেই তার কি হম্বি তম্বি—। গোপিনী ভয়ে ঘেমেনেয়ে সারা। কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না। রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কি করি ?

এমন সময় দরজায় কড়া নেড়ে কে একজন বলে উঠল, "এই গোপ বাড়ি আছ ?"

কথাও শেষ হয়নি কোটালের, ছেলে তো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গোপিনীর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, "এই, বাবা !"

গোপিনী নিরীহ বটে, তবে বুদ্ধিও তার কম ছিল না। সে বুঝল বাপের ভয়ে ছেলে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। সেও ফিসফিস করে বলল, "বাবা তো কি হয়েছে ?"

"না না তুমি বুঝছ না।" ছেলে বলল, "বাবা আমাকে এখানে দেখলে মেরে ফেলবে। আমাকে বাঁচাও।"

গোপিনী দেখল এই সুযোগ। বলল, "বাঁচাব ? কি করে ?"

কোটাল ছেলে বলল, "যে করেই হোক। কথা দিচ্ছি, আর আসব না আমি !"

গোপিনী বলল, "ঠিক তো ? তবে যাও, উঠোনের কোণে যে ধানের গোলাটা আছে তার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়।"

তারপর কোটালের ছেলে কি আর দাঁড়ায় ? সে এক ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ধানের গোলার নীচে।

এদিকে গোপিনী গিয়ে দরজা খুলে দিতেই কোটাল বাড়িতে ঢুকে বলল, "গোপ বুঝি বাড়ি নেই ?"

ভয়ে তো গোপিনীর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া ! একজনের হাত থেকে তো বেঁচেছে, এখন এ কি করবে কে জানে ! মাথা নাড়ল। গোপিনী—"না বাড়ি নেই।"

"বেশ বেশ—।" কোটাল বলল, "তাহলে একটু বসি।" বলে সে বসবার ঘরে গিয়ে বসে বলল, "কই এখানে এস।"

গোপিণী কি করবে বুঝতে পারছিল না। কাঁপছিল ভয়ে।

কোটাল আবার তাড়া দিল, "কই, কি হল?"

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই গোপ এসে উপস্থিত। দরজায় কড়া নেড়ে গোপ বলল, "বউ দরজা খোল।"

ব্যস, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কোটাল। ফিসফিস করে বলল, "গোপ এসেছে বুঝি?"

ততক্ষণে গোপিণীর কিন্তু সাহস ফিরে এসেছে। সে বলল, "হ্যাঁ, না উঠছেন কেন? আপনি গোপের কাছেই তো—।"

কথা শেষ হয়নি তার। কোটাল বলে উঠল, "না না, তুমি বুঝছ না, কারো অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি যাওয়াটা আমাদের রাজা আবার পছন্দ করে না কিনা, আমি যাই।"

গোপিণী বলল, "যাবেন? কিন্তু গোপ তো দেখবেই আপনাকে, যদি রাজার কাছে নালিশ করে?"

মহা চিন্তিত হয়ে কোটাল বলল, "যে করেই হোক আমাকে বাঁচাও। কথা দিচ্ছি, আর আসব না এখানে।"

সুযোগ পেয়ে গোপিণী বলল, "ঠিক তো? তবে এক কাজ করুন, হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে যেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন এমন ভাব দেখিয়ে চলে যান। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। গোপকে যা বলার আমি বলব। যান।" বলে সে দরজা খুলে দিতেই কোটাল ক্রুদ্ধ ভাব দেখিয়ে গোপকে ধাক্কা মেরে চলে গেল।

থতমত খেয়ে গেল গোপ। ঘরে এসে জিজ্ঞেস করল, "বউ, এ কি! কোটাল এখানে কেন?"

"আর বল কেন?" গোপী বলল, "কোটাল তার ছেলের উপর খুব রেগে গেছে। তার ছেলেও পালাতে গিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে। অযথা ছেলেটাকে না কোটাল পেটাপেটি করে তাই তাকে

আমি ধানের গোলার নিচে লুকিয়ে রেখেছি। কোটাল তাকে না পেয়ে চলে গেছে। এই দেখ না—। বলে গোপী কোটালের ছেলেকে ধানের গোলার নিচে থেকে টেনে এনে দেখাল গোপকে। তারপর কোটালের ছেলেকে বলল, "এই তোমার বাবা চলে গেছে, তুমিও পালাও।"

গোপীর কথা শেষ না হতে মাথা নিচু করে কোটালের ছেলে এক ছুটে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। হেসে উঠল গোপ ও গোপী।

"তাই বলছিলাম—"দমনক বলল, "কৌশলে তাদের দুইজনের মধ্যে ভেদ ঘটাব। শোন—

কৌশলে যা করা যায় পরাক্রম দ্বারা তা করা যায় না। যেমন কাক সোনার হারের কৌশল দ্বারা কালসাপকে বিনাশ করেছিল।

করটক বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শোন।" দমনক বলতে লাগল—

এক গাছে এক কাক তার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করত। কিন্তু তার ভাগ্য ছিল খারাপ। সে তার সন্তানগুলি বাঁচাতে পারত না। কারণ ওই গাছের কোটরে একটা কালসাপ বাস করত। সে সুযোগ পেলে কাকের বাচ্চাগুলি খেয়ে ফেলত। তাই একদিন কাকের স্ত্রী বলল, "দেখ, চল আমরা কোথাও চলে যাই। না হলে কালসাপের কবল থেকে আমরা বাচ্চাগুলিকে বাঁচাতে পারব না। কথায় আছে না—

দুশ্চরিত্রা ভার্যা, শঠ মিত্র, মুখের উপর জবাব দেওয়া ভৃত্য, আর ঘরে সাপ নিয়ে বাস মৃত্যুতুল্য—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

কাক বলল, "হুম্, কিন্তু ভয় কর না। আমি বারবার তার অপরাধ সহ্য করেছি। আর না।"

"কি করবে?" কাকের স্ত্রী বলল, "তার সঙ্গে বিবাদ করবে?"

কাক বলল, "যাহোক একটা ব্যবস্থা করব।

যার বুদ্ধি আছে তারই বল আছে। নির্বোধের আর শক্তি কোথায়? দেখ, মদগর্বিত সিংহ খরগোসের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল।"

"কি রকম?" কাকের স্ত্রী বলল।

"তাহলে শোন।" কাক বলতে লাগল—

গল্প : নয়
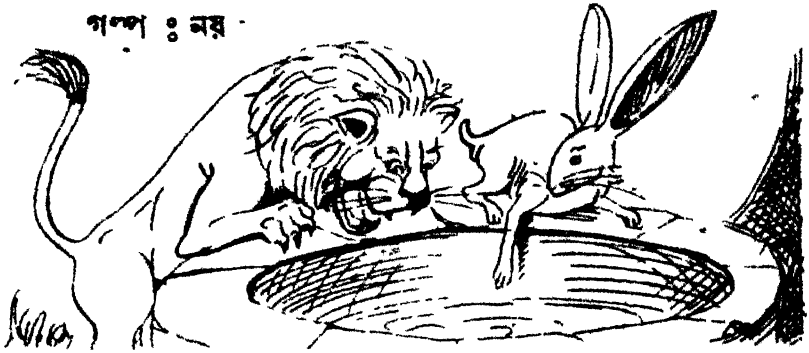
মন্দর পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল। সে এমনি দুর্দান্ত ছিল যে কোন পশুই তার হাত থেকে নিস্তার পেত না।

দিন যায়। পশুরা ভয়ে ভয়ে থাকে। একদিন তারা সবাই মিলে সিংহের কাছে গিয়ে বলল, "প্রভু, আপনি কষ্ট করে কেন শিকার করবেন, তারচেয়ে আমরাই না হয় পালা করে রোজ একজন আপনার কাছে আসব। আপনি তাকে খাবেন।"

সিংহ হেসে বলল, "তা তোমরা যদি এ ঠিক করতে পার তবে আমার আপত্তি নেই।"

সেই থেকে রোজ পালা করে একজন সিংহের কাছে যেত। আর সিংহও তাকে খেয়ে ফেলত।

একদিন এক বৃদ্ধ খরগোসের পালা পড়ল। তাকে সিংহের কাছে যেতে হবে। সে পড়ল দুশ্চিন্তায়। কি করে? পা আর চলে না তার। তবু যেতেই হচ্ছে। গুটি গুটি যাচ্ছে আর ভাবছে। হায় রে! কি কপাল আমার! যা হোক খানিক দূর গিয়ে তার মনে হল, কেন? এত ভাবছি কেন?

জীবনের আশাতেই মানুষ ভয়ের কাছে বিনয় প্রকাশ করে।

কিন্তু মরেই যখন যাব তখন সিংহের কাছে বিনয় প্রদর্শন করে আমার কি হবে ?

তাই সে আস্তে আস্তে অনেক বেলায় গিয়ে উঠল সিংহের কাছে। এদিকে সিংহের পেয়েছে ভয়ানক ক্ষুধা। তার ওপর এসেছে এতটুকু একটা পুঁচকে খরগোস। সে তো গেল বেজায় চটে। জিজ্ঞেস করল, "কি রে ! এত দেরি করে এলি ?"

খরগোস তখন হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে, কি করব বলুন—আমি তো অনেক আগেই এসে পড়তাম। কিন্তু পথের মধ্যে আটকা পড়লাম যে। আর একটা সিংহ এসে পথ আটকে বলল—এই কোথায় যাচ্ছিস ? এদিকে আয়—আমি তো হুজুর আপনার কথা বললাম। তাতে তার কি রাগ। বলে—কি, আমি থাকতে তুই যাবি আর এক সিংহের কাছে ?—আমি তখন হুজুর তার কাছে হাতজোড় করে বললাম, আজ্ঞে না, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি হুজুর, আমি তার কাছ থেকে ঘুরে আপনার কাছে আবার আসব। অতসব বলে কয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। তাই তো দেরি হয়ে গেল।"

"কী ?" সিংহ উঠল লাফ দিয়ে, "এতবড় আস্পর্দা ! আমি থাকতে তোকে খাবে আর একটা সিংহ। কই, চল তো দেখি। দেখিয়ে দে তো আমাকে। দেখি কত বড় সিংহ সে ?"

তখন খরগোস মনে মনে হেসে সিংহকে নিয়ে গেল একটা পুরোনো কুয়োর কাছে। বলল, "হুজুর উঁকি দিয়ে দেখুন। এটার মধ্যে বসে আছে সিংহটা।"

"কই, কই দেখি, কত বড় আস্পর্দা তার।" বলে সিংহ কুয়োর ধারে গিয়ে উঁকি দিয়ে জলের মধ্যে তার প্রতিচ্ছায়াটা দেখে বলল, "এটা ? এটাই তোকে আটকেছিল ?"

খরগোস হাতজোড় করে বলল, "হ্যাঁ, হুজুর—আপনাকে দেখেই নিচে নেমে গেছে।"

"হুম্-ম্—।" বলে কেশর নেড়ে নিচের দিকে চেয়ে সিংহ উঠল গর্জন করে। সঙ্গে সঙ্গে তার জলের প্রতিবিম্বটাও উঠল গর্জন করে। তাতে সিংহ গেল আরও রেগে। "—কি, আমাকে দেখে গর্জন! দাঁড়া।" বলে সে এক লাফে গিয়ে পড়ল কুয়োর জলে। ব্যস, হয়ে গেল। কুয়োর ভেতর থেকে কি আর উঠতে পারে সিংহ! সে হাবুডুবু খায় আর গর্জন করে। লাফ দিয়েই সে বুঝেছিল খরগোসের চালাকি। কিন্তু তখন আর বুঝে কি লাভ? উঠতে পারলে তো! এখানেই তার জীবনের শেষ।

খরগোস তো তারপর তাধিন, তাধিন করে নাচতে নাচতে সবাইকে গিয়ে খবর দিল! বনের পশুরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

তাই বলছিলাম—কাক বলল, "বুদ্ধি করেই সব করতে হবে।"

তার স্ত্রী বলল, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি করবে?

কাক বলল, "শোন। ঐ যে সরোবরটা দেখছ—এক রাজপুত্র রোজ সেখানে স্নান করতে আসেন। তিনি তার গলার হারটা ঘাটের উপরে রেখে জলে নামেন। তুমি করবে কি, আজ যখন রাজপুত্র গলার হারটা ঘাটের উপরে রেখে স্নান করতে নামবেন, তখন চট করে ঠোঁটে করে হারটা নিয়ে গিয়ে কালসাপটার গর্তে রেখে দিয়ে পালিয়ে চলে আসবে। এখন সাপটা বাসায় নেই, ভয় নেই তোমার তারপর দেখ না কি হয়।"

বলতে না বলতেই লোকলস্কর নিয়ে রাজপুত্র এলেন স্নান করতে।

কাক তার স্ত্রীকে বলল, "ঐ দেখ তিনি এসেছেন। তুমি তৈরি হও। আমি ঐ উঁচু ডালটায় গিয়ে বসছি। যাও যাও।" বলে কাক উড়ে গিয়ে বসল উঁচু ডালে।

তারপর যথারীতি রাজপুত্র জলে নামলে কাকের স্ত্রীও হঠাৎ উড়ে গিয়ে হারটা ঠোঁটে তুলেই হাওয়া।

হৈ হৈ করে উঠল সব লোকজন। কিন্তু হৈ হৈ করলে কি হবে,

উড়তে তো আর পারে না ? লাঠিসোটা নিয়ে ছুটল কাকের স্ত্রীর পেছন পেছন। ততক্ষণে কাকের স্ত্রী তো হারটা চট করে সাপের গর্তে ফেলে দিয়ে কাকের কাছে এসে বসেছে।

সাপটাও সেই সময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে ঢুকেছে গর্তে। সে তো আর হারটারের কথা কিছু জানে না ? ঝিমুচ্ছে বসে বসে।

এদিকে হারের খোঁজে বন তোলপাড়। লোকজন তো মেলাই ছিল। খুঁজতে খুঁজতে ঠিক পেয়ে গেল হারটা সাপের গর্তে। তারপর সাপটাকে শেষ করে হারটা পেতে আর কতক্ষণ।

"তাই বলছিলাম—" দমনক বলল, "কৌশল করেই সব কিছু করতে হবে।"

"তাহলে—" করটক বলল "যা ভাল বোঝ কর।"

তারপর দমনক সিংহের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল, "মহারাজ একটা অমঙ্গলের কথা জেনে এসেছি আপনার কাছে।"

"সে কি !" সিংহ বিস্মিত হয়ে বলল, "কি কথা ? বল, বল।"

"আজ্ঞে মহারাজ," দমনক বলতে লাগল, "আপনি তো জানেন—

হিতৈষী জন আপৎকালে, অসৎপথ অবলম্বনের সময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময় অতিবাহিত হওয়ার কালে জিজ্ঞাসিত না হয়েও হিতবাক্য বলবে।

ভোগের পাত্র রাজা, রাজ্য পরিচালনায় পাত্র মন্ত্রী।

রাজকার্য ব্যাঘাতকারী মন্ত্রী দোষী।

বরং প্রাণ পরিত্যাগ করা ভাল অথবা শিরচ্ছেদন হওয়া ভাল কিন্তু প্রভুর পদাকাঙ্ক্ষী পাপীকে উপেক্ষা করা ভাল নয়।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে সিংহ বলল, "ঠিক কথা। তা তুমি কি বলতে এসেছ ?"

"আজ্ঞে—" দমনক বলতে লাগল, "এই সঞ্জীবক তো, মহারাজ,

অন্যায় ব্যবহার করছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার নিন্দা করে রাজ্যটি গ্রহণ করবে।

"অ্যা, বল কি ?" সিংহ তো গেল ঘাবড়ে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" দমনক বলল, "আপনি তাকে সব কাজের ভার দিয়ে অন্যায় করেছেন হুজুর।

কারণ জানেন তো—

রাজা যদি সকল কার্যে একজন সচীবকে প্রধান করেন, তবে মোহবশত গর্ব এসে তাকে আশ্রয় করে এবং গর্বোদ্ধত অলসতায় সে রাজার কাছ থেকে দূরে চলে আসে (অর্থাৎ রাজার বিরাগভাজন হয়) পরে ঐ বিচ্ছেদে মন্ত্রীর মনে স্বতন্ত্রবোধ জন্মায়। তারপর সে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় রাজার জীবন পর্যন্ত নাশ করতে উদ্যত হয়।

মহারাজ—বিশমিশ্রিত অন্ন, শিথিল দন্ত এবং দুষ্ট মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

তাই বলছিলাম সঞ্জীবকও যা ইচ্ছে তাই করছে। এ সম্বন্ধে আপনি যা করবার করুন।"

সিংহ বলল, "দমনক তোমার কথা সত্য হলেও, কি জান সঞ্জীবকের সঙ্গে তো আমার ভাব রয়েছে। কি করি বল তো—

যে প্রীতিভাজন সে অনিষ্ট করলেও প্রিয়ই থাকে। নিজের শরীর বহুবিধ রোগে দূষিত হলেও কার না প্রিয় ?

যে প্রীতিভাজন সে অপ্রিয় কাজ করলেও প্রিয়ই থাকে। আগুন ঘর এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি দহন করলেও আগুনকে কে অনাদর করে ?"

দমনক বলল, "প্রভু, হিতকর কাজ আপাতত অপ্রিয় হলেও পরিনামে সুখপ্রদ। যেখানে হিতকর অপ্রিয় (উপদেশক) বক্তা বা শ্রোতা আছে সেখানে সকলপ্রকার সম্পদই বিদ্যমান থাকে। আপনি কুলক্রমাগত ভৃত্যদের ছেড়ে নতুন,

আগন্তুককে কাজে লাগিয়েছেন, এ অ:ন্ত অন্যায় ?"

সিংহ বলল, "আরে, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। অভয় দিয়ে যাকে আমি শ্রেষ্ঠপদ দিয়েছি, সে আমার অপকার করবে কেন ?"

"তাই হয় প্রভু, তাই হয়। দমনক বলল, "জানেন না—

দুর্জনকে প্রতিদিন বিবিধ উপচারে সন্তুষ্ট করলেও সে আরাধ্য হয় না। যেমন কুকুরের লেজে চাপ দিয়ে, তেল মালিশ করলেও সোজা হয় না। তাই বলছিলাম—

যার যা স্বভাব আছে সে প্রাণীর তা অতিক্রম করা কষ্টকর। কুকুরকে যদি রাজা করা যায় তাহলেও সে কি জুতা খায় না ?

তাই মহারাজ—যার অহিত ইচ্ছা করি না, অজিজ্ঞাসিত হলেও তার হিতকর বাক্য বলা সাধুর ধর্ম। এর বিপরিত কর্ম অধর্ম।

অতএব মহারাজ, সঞ্জীবক থেকে যদি সাবধান না হন, পরে কিন্তু আমার দোষ দেবেন না।

"হুম্ !" পিঙ্গলক ঘাবড়ে গিয়ে ভাবতে লাগল,—

অন্যের নিন্দাবাক্য শুনে অপরকে শাস্তি দেবে না। নিজে অনুসন্ধান করে তাকে শাস্তি দেবে বা সম্মান করবে। কারণ কথায়ই তো আছে—

ন্যায়ানুসারে দোষ গুণ বিচার করে অনুগ্রহ করা বা দণ্ড দেওয়া অহঙ্কারবশত সাপের মুখে হাত ঢুকিয়ে দেওয়ার মত আত্মনাশের কারণ হয়।

তারপর সে মাথা চুলকে বলল, "তাহলে কি সঞ্জীবককে পরিত্যাগ করব ?"

"না, না মহারাজ— !" দমনক বলল, "তা করবেন না। তাহলে গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কথায়ই তো আছে—

যে ভাবেই হোক মন্ত্রণা বীজ যাতে প্রকাশ না পায়

সেভাবেই সুরক্ষিত রাখা উচিত। প্রকাশিত হলে কাজ
সফল হয় না।

তবে হ্যাঁ মহারাজ, একটা কথা, সঞ্জীবকের দোষ দেখেও যদি তা নিবারণ করে তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন তাহলে কিন্তু অন্যায়।"

সিংহ বলল, "আচ্ছা, তুমি কি জান সে কিভাবে আমাদের অনিষ্ট করবে?"

দমনক বলল, "না মহারাজ—

সহায় ও সাধনবল তার কি প্রকার আছে তা না জেনে
সামর্থ নির্ণয় করব কি করে? এই দেখুন না, একটা টিট্টিভ
পাখি সমুদ্রকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

"তাই নাকি?" সিংহ বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন মহারাজ।"

দমনক বলতে লাগল—

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে এক টিট্টিভ তার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত।

একদিন টিট্টিভী টিট্টিভকে বলল, "দেখ আমার ডিম পাড়বার সময় হয়েছে। তুমি একটা ভাল জায়গায় বাসা দেখ।"

টিট্টিভ বলল, "সেকি! সমুদ্রতীর কেমন খোলামেলা। সমুদ্র-তীরের মত জায়গা আর কোথায় পাবে?"

টিট্টিভী বলল, "না, তুমি বুঝতে পারছ না। এখানে থাকলে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডিমগুলি ভেসে যাবে না?"

হেসে উঠল টিট্টিভ। বলল, "কি যে বল। আমি থাকতে আমার বাসা থেকে সমুদ্র নিয়ে যাবে ডিম?"

মনে মনে হেসে টিট্টিভী বলল, "না, তা বলছি না। তবে তোমার ও সমুদ্রের মধ্যে অনেক প্রভেদ তো, তাই বলছিলাম। জান তো—

নিজে বিপদ নির্ধারণ করতে যোগ্য বা অযোগ্য এ সম্বন্ধে
যার বোধ আছে সে দুঃখেতেও বিষাদপ্রাপ্ত হয় না।
অনুচিত কর্ম আরম্ভ করা, স্বজনবিরোধ, বলশালীর সঙ্গে

বিবাহ এবং স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা এই চারটিই মৃত্যুর যায়। যাকগে, যা বলেছে তাই হবে।" বলে সে চুপ করে রইল।

তারপর দিন যায়। টিট্টিভী সেখানেই ডিম পেড়ে রয়ে গেল।

সমুদ্র কিন্তু টিট্টিভের কথাগুলি শুনেছিল। সে করল কি টিট্টিভের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য একদিন তাদের বাসাশুদ্ধ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। টিট্টিভী পড়ল বিপদে। সে কেঁদে টিট্টিভকে বলল, "প্রভু, তুমি তো বলেছিলে বাসা বদলাবে না। এখন যে ডিমগুলি সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেল, কি হবে?"

টিট্টিভও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে বলল। "না না, ভয় পেয়ো না। দেখছি কি করা যায়।" বলে সে সব পাখিকে একত্র করে পক্ষিরাজ গরুড়ের নিকট গিয়ে বলল, "প্রভু, দেখুন আমার কোন দোষ নেই অথচ সমুদ্র আমাদের ডিমগুলি সব নিয়ে গেছে।"

গরুড় তখন টিট্টিভকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান নারায়ণের কাছে গিয়ে সব জানালেন।

তখন নারায়ণ সমুদ্রকে ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন। নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য না করে সমুদ্র পাড়ে? সে তক্ষুনি টিট্টিভকে সব ডিমগুলি ফিরিয়ে দিল।

তাই মহারাজ সহায় ও সাধনবলের কথা বলছিলাম।" বলে দমনক চুপ করল।

রাজা বলল, "আচ্ছা সঞ্জীবক যে আমার অনিষ্টসাধন করতে যাচ্ছে —তা কি করে বুঝব?"

"কেন মহারাজ?" দমনক বলল, "সে যখন শিং উঁচিয়ে আসবে তখনই বুঝতে পারবেন।"

"শিং উঁচিয়ে?" সিংহ ঘাবড়ে গেল। বলল, "তাহলে তো ভাবতে হয়।"

"হ্যাঁ মহারাজ আপনি ভাবুন। আমি যাই।" বলে দমনক সোজা চলে গেল সঞ্জীবকের কাছে।

সঞ্জীবক দূর থেকে দমনককে দেখেই বলে উঠল, "আরে-আরে দমনক ভায়া যে। কি খবর?"

"আর খবর।" দমনক বলল, "পরাধীনের আবার খবর। জানই ত—

যে রাজার অধীন তার সম্পত্তিও পরের অধীন, মন থাকে সর্বদা অসুখী, নিজের জীবনের প্রতিও থাকে অনিশ্চয়তা (কি জানি কখন দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হয়)।

সঞ্জীবক বলল, "এমন কথা বলছ কেন বন্ধু?"

"বলবনা কেন?" দমনক বলল, "আমার মত ভাগ্য আর কার আছে?

সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি একটা সাপকে আশ্রয় পেলে যেমন ত্যাগও করতে পারে না, ধরতেও পারে না, আমিও তেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। কারণ—

একদিকে রাজার বিশ্বাস নষ্ট, আর একদিকে বন্ধুর প্রাণ নষ্ট। কি করি, কোথায় যাই? পড়েছি দুঃখ সাগরে।"

সঞ্জীবক বলল, "বন্ধু খুলে বল।"

"আর কি বলব ভাই।" দমনক বলল, "শুনে এলাম প্রভু বলেছেন—সঞ্জীবককে হত্যা করে পরিতৃপ্তি সাধন করব।"

আঁতকে উঠল সঞ্জীবক। "কি বললে? কেন?"

"তা জানি না ভাই।" দমনক বলল, "তবে তুমি ঘাবড়িও না।"

কিন্তু তাতে কি সঞ্জীবকের মন মানে? সে ভাবতে লাগল, দমনক কি মিছে কথা বলল? তার মুখ দেখে তো কিছু বোঝাও যায় না। হায় রে!

দমনক বলল, "না, এত ভাবনার কিছু নেই।"

সঞ্জীবক বলল, "আচ্ছা ভাই বলতে পার, আমি রাজার কি ক্ষতি করেছি? না বিনা কারণেই রাজারা ক্ষতি করেন?"

"তাই তো বলছি ভাই—।" দমনক বলল, "কি জান—

অসজ্জনের শত উপকার করলেও তা বিফল হয়, মূর্খের নিকট শত হিতকথাও বিফল, যে কথার বাধ্য নয় তার কাছে শত কথা আর জড়বুদ্ধির কাছে শত বুদ্ধিও অচল।

এই প্রভুর মুখে মধু অন্তরে বিষ।"

'হায়, হায়' করে উঠল সঞ্জীবক। ভাবল, হায় রে! আমি শস্যভোজী, সিংহ আমাকে হত্যা করবে কেন! কে যে তাকে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করে তুলেছে জানি না। যা হোক, বিরুদ্ধ রাজা থেকে ভয় করাই উচিত। কারণ, কথায়ই তো বলে—

বজ্র এবং রাজার প্রতাপ দুই-ই অতি ভীষণ। বজ্র পড়ে এক জায়গায় আর রাজার প্রতাপ সর্বত্র।

তাহলে যুদ্ধে মৃত্যুকেই আশ্রয় করা ভাল, রাজার আদেশ পালন করা উচিত নয়।

যে সময় যুদ্ধ না করলে নিশ্চিত নাশ, আর যুদ্ধ করলে জীবন-সংশয় সেই সময়কেই তো পণ্ডিতরা যুদ্ধের কাল বলেন।

যুদ্ধ জয়ে সম্পদ লাভ আর মরণে লাভ স্বর্গ। দেহ ক্ষণস্থায়ী —তবে যুদ্ধে মৃত্যুর কি চিন্তা?

দমনক বলল, "কি ভাবছ বন্ধু?"

সঞ্জীবক বলল, "আচ্ছা ভাই বলতে পার রাজা আমাকে কেন, এবং কিভাবে হত্যা করবেন?"

দমনক বলল, "আরে এ তো সোজা। তিনি যখন কান খাড়া করে, লেজ উঁচু করে, সামনের পা দুখানি এগিয়ে হাঁ করে তোমার দিকে তাকাবেন তখন তুমিও তোমার বীরত্ব দেখাবে। জান না—

বলবানও নিস্তেজ হলে কার না অবজ্ঞার পাত্র হয়? লোকে ভস্মরাশির মধ্যে নির্ভয়ে পদক্ষেপ করে তবে একথা যেন গোপনে

থাকে। না হলে তুমিও বাঁচবে না; আমিও বাঁচব না। এখন আমি যাই ভাই।" বলে দমনক করটকের সঙ্গে দেখা করল।

করটক জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, বিচ্ছেদ করাতে পেরেছ রাজা আর সঞ্জীবককে?"

"তবে?" দমনক হেসে বলল, "আরে, আমি যখন কাজে নেমেছি তখন বিচ্ছেদ না হয়ে পারে?" বলে সে গেল রাজার কাছে।

তাকে দেখেই পিঙ্গলক জিজ্ঞাসা করল, "কি হে! আর কোন খবর আছে?"

"আছে, মহারাজ।" দমনক বলল, "তাই তো ছুটে এসেছি। সঞ্জীবক আসছে। আপনি কান খাড়া করে, লেজ উঁচিয়ে, দুই পা সামনে রেখে তৈরি হয়ে থাকুন।" বলেই সে আড়ালে গিয়ে চুপকরে বসে রইল।

একটু বাদেই সঞ্জীবক তো দমনকের কথামত শিঙ উচিয়ে তেড়ে এসেছে। এসেই দেখে, হ্যাঁ, দমনক যেমন বলেছিল ঠিক তেমনভাবেই বসে আছে সিংহ। দেখে তো তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল—"কি তুই আমার জন্য বসে আছিস? তবে এই দেখ—।" বলে সে গেল তেড়ে।

সিংহও তো তৈরি হয়ে বসেছিল সঞ্জীবকের জন্য। তাকে এমনভাবে ছুটে আসতে দেখে সেও বুঝল, হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছিল দমনক। সেও তখন গেল ক্ষেপে। "কি আমি তোকে এত বিশ্বাস করেছিলাম, আর তুই এসেছিস আমাকে হত্যা করতে? তবে এই দেখ—।" বলে সিংহও উঠল লাফিয়ে।

ব্যস, লেগে গেল যুদ্ধ সিংহ ও ষাঁড়ে। সে কি গর্জন। কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না। তবু সিংহ শত হলেও সিংহ। সঞ্জীবক কি আর পারে তার সঙ্গে? খানিক যুদ্ধ করেই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। যুদ্ধ শেষ করে সিংহও বসে বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়েই গেল। শত হলেও তারই তো বন্ধু সঞ্জীবক। চুপচাপ

বসে অনুতাপ করতে লাগল রাজা।

দমনক কিন্তু এতক্ষণ এগিয়ে আসেনি। এখন সিংহকে বসে বসে অনুতাপ করতে দেখে সে এসে বলল, "কি মহারাজ কি ভাবছেন বসে বসে?"

"নাঃ, কিছু না।" বলে সিংহ ঘাড় নেড়ে বলল, "ভাবছি, সঞ্জীবক তো আমার বন্ধুই ছিল—।"

কথা শেষ হবার আগেই দমনক বলল, "সে কি মহারাজ! শত্রুকে হত্যা করে ভাবছেন; কথায় আছে না—

পিতা ভ্রাতা, পুত্র বা সুহৃদ যদি রাজার প্রাণনাশে উদ্যত হয় তবে মঙ্গলকামী রাজা তাদের অবশ্যই বধ করবেন। আর—

ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অত্যন্ত দয়ালু হওয়া উচিত নয়। তাহলে ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজের হস্তগত ধনও রক্ষা করতে সমর্থ হয় না।

মহারাজ—রাজ্যলোভে অহঙ্কারবশত প্রভুর পদাকাঙ্ক্ষী পাপীর জীবন উৎসর্গই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তার আর দ্বিতীয় নেই।

দমনকের কথায় রাজা একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, "তুমি বলছ, আমি আর ভাবব না?"

"হ্যাঁ মহারাজ" দমনক বলল, "আপনি ভাবনা ছেড়ে দিন।"

সিংহও তারপর আবার আগের মতই সিংহাসনে বসল। দমনকও বলে উঠল, "মহারাজের জয় হোক।"

"এখন বুঝলে তো—" গুরুদেব রাজপুত্রদের বললেন, "সুহৃদভেদ কাকে বলে?"

"হ্যাঁ গুরুদেব ভারী সুন্দর—।" রাজপুত্রেরা বলল, "আমরা বুঝেছি।"

"বেশ, বেশ।" গুরুদেব বললেন, "তাহলে আজ এ পর্যন্তই, কাল আবার বলব।" বলে তিনি উঠে গেলেন।

বিগ্রহ

তার পরদিন বিষ্ণুশর্মা এসে সুহৃদ্ভেদ সম্বন্ধে রাজপুত্রদের পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আজ তোমাদের আমি বিগ্রহ সম্বন্ধে বলব—কি করে সমান বলশালী হাঁসের সঙ্গে ময়ূরের যুদ্ধে কাক শত্রুগৃহে থেকে কিভাবে হাঁসেদের পরাজিত করেছিল।"

"কি করে গুরুদেব ?" রাজপুত্রেরা বলে উঠল।

"তাহলে শোন।" গুরুদেব বলতে লাগলেন :
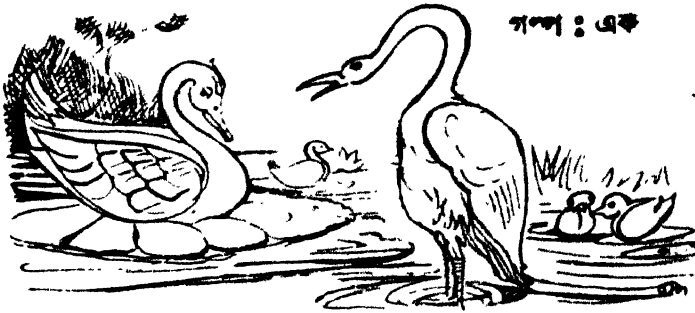
কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে একটা সাগর আছে। সেখানে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহাঁস বাস করত। সকল জলচর পাখি তাকে রাজা বলে মানত।

একদিন হিরণ্যগর্ভ একটা বিরাট পদ্মপাতায় অনুচরবর্গ নিয়ে বসে আছে, এমন সময় তারই এক অনুচর দীর্ঘমুখ এসে প্রণাম করে বসল।

রাজা জিজ্ঞেস করল, "দীর্ঘমুখ, কি খবর ? তুমি অনেক দেশ ঘুরে এসেছ। খবর বল।"

দীর্ঘমুখ বলল, "মহারাজ, খবর বলবার জন্যই এসেছি। জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে একটি পর্বত আছে। সেখানে চিত্রবর্ণ নামে এক ময়ূর বাস করে।

একদিন আমি দণ্ডারণ্যে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে তার অনুচর পাখিরা এসে আমায় ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল, "আমি কে? কোত্থেকে এসেছি?"

আমি বললাম, "আমি কর্পূরদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হিরণ্যগর্ভ নামক রাজহাঁসের অনুচর। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।"

তাতে তারা কি মনে করল কে জানে? জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতে পার, এ দুটি দেশের মধ্যে কোন দেশ এবং রাজা শ্রেষ্ঠ?"

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, "বলতে পারব না কেন? কর্পূরদ্বীপ হল স্বর্গের অংশ, আর রাজা হলেন গিয়ে তার দ্বিতীয় অধিপতি। এর সঙ্গে কি আর তোমাদের দেশের তুলনা চলে? এ তো মরুভূমি বিশেষ।"

তাতে তারা গেল রেগে। বলল, "তুমি মূর্খ, তোমার সঙ্গে কথা বলাও বৃথা। কথায় আছে—

সাপকে দুধ পান করালেও যেমন কেবল বিষই বাড়ে তেমন মূর্খদের উপদেশ দিলেও তারা ক্রুদ্ধই হয়, শান্ত হয় না। বিদ্বানদেরই উপদেশ দেওয়া উচিত। মূর্খদের কখনও উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। মূর্খ বানরদের উপদেশ দিয়েই না পাখিরা আবাসচ্যুত হয়েছিল।"

রাজা বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন মহারাজ।" দীর্ঘমুখ বলতে লাগল:

গল্প : দুই

নর্মদা নদীর তীরে পর্বতের উপত্যকায় একটা বিরাট শিমূলগাছে বহু পাখি বাসা বেঁধে বাস করত।

একদিন বর্ষাকালে ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে, পাখিরা বাসায় বসে আছে। হঠাৎ তাদের নজরে এল গাছের নিচে কতগুলি বানর বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে আর শীতে কাঁপছে। তাদের দেখে পাখিদের দয়া হল। কিন্তু পাখি এরা, দয়া হলেও তো কিছু করতে পারে না, তাই একটি পাখি হঠাৎ বলে উঠল—তোমরা কি হে, দিব্যি হাত-পা আছে বাসা তৈরি করতে পার না? আমরা দেখ তো, ঠোঁট দিয়েই কেমন বাসা তৈরি করেছি।

ব্যস, রেগে গেল বানরের দল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল—আস্পর্দা দেখেছিস পাখিগুলোর, আমাদের উপদেশ দিতে আসছে! একটা শিক্ষা না দিলে তো চলছে না। কি বলিস তোরা?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—ঠিক বলেছিস। দাঁড়া, বৃষ্টি থামুক, তারপর শিক্ষা দিতে হবে।

মূর্খের তো উপদেশ কাজে লাগে না। কিচির-মিচির করে বানরগুলির কি লম্ফঝম্প। বৃষ্টি থামতেই তারা করল কি, লাফ দিয়ে গাছে উঠে পাখিগুলির বাসা ভেঙে একবারে তছনছ করে দিল। আশ্রয়চ্যুত হল পাখির দল। তাই বলছিলাম বিদ্বানদেরই উপদেশ দেওয়া উচিত।"

"হুম্, তা তো হল—" রাজা বলল, "কিন্তু চিত্রবর্ণের কি হল?"

"তারপর মহারাজ।" দীর্ঘমুখ বক বলতে লাগল, "পাখিরা তো ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—রাজহাঁসকে কে রাজা করেছে? শুনুন কথা—আমি তো গেলাম ভীষণ রেগে, জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ময়ূরকে কে রাজা করেছে? তাতে ওরা আরও রেগে আমাকে হত্যা করতে এল। কিন্তু আমিও কম যাই কিসে? রুখে উঠলাম তক্ষুনি। ঘাবড়ে গেল তারা।"

রাজা হেসে বলল, "ঠিকই বলেছ—

যে নিজের ও শত্রুর সবলত্ব ও দুর্বলত্ব বিচার করে প্রভেদ বুঝতে পারে না সে শত্রুর দ্বারা পরাজিত হয়।

বহুদিন যাবৎ প্রতিদিন বাঘের চামড়াপরা নির্বোধ গাধা শস্যক্ষেতে শস্য খেতে গিয়ে বাকসংযমের অভাবে চিৎকার করে নিহত হয়েছিল।"

বক বলল, "কি রকম মহারাজ?"

"তাহলে শোন।" রাজা বলতে লাগল:

গল্প ঃ তিন

হস্তিনাপুরে বিলাস নামে এক ধোপা ছিল। তার ছিল একটা গাধা। খাটতে খাটতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে। ঠিকমত খাটতেও পারে না। ধোপাও পড়ল বিপদে।

একদিন ধোপা ভাবল, নাঃ, গাধাটাকে বনের পাশে ছেড়ে দিয়ে আসি। খেয়েদেয়ে মোটা হলে আবার আনব। কিন্তু বাঘ যদি খেয়ে ফেলে, তাই সে করল কি গাধাটার গায়ে একটা বাঘের চামড়া পরিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল বনের পাশে।

এখন গাধাটার হয়েছে খুব মজা। খাটতেও হচ্ছে না আর খেতেও অসুবিধে নেই। তাকে দেখে জন্তুজানোয়ার তো বটেই, মানুষও তার ধারেকাছে আসে না। সবাই তাকে বাঘ বলেই ধরে নিয়েছে। মনের আনন্দে সে ঘাস খায়।

তারপর দিন যায়। সে এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। বাঘের চামড়ার জন্য সবাই তাকে ভয় পায় বলে দিনে দিনে তার সাহসও বেড়েছে।

এরই মধ্যে সে গ্রামে এসেও এর ক্ষেতে ওর ক্ষেতে শস্য খেয়ে বেড়ায়। বাঘের ভয়ে কৃষকরাও পালিয়ে যায়। ক্ষেতে ঢুকতেই পারে না। কিন্তু তাহলেও তো তারা ছেড়ে দিতে পারে না। মরীয়া হয়ে একদিন এক কৃষক তীর-ধনুক নিয়ে এসে লুকিয়ে রইল ক্ষেতের কাছে। গাধাটা তখন ঘাস খেয়েই যাচ্ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা লোক

লুকিয়ে রয়েছে তীর-ধনুক নিয়ে। লোকটাকে দেখে গাধাটা গেল রেগে। রাগ হবে না কেন? এতদিন তো সে দেখে এসেছে তাকে দেখে লোকে পালিয়ে যায়। তাই তার সাহসও গিয়েছিল বেড়ে। তাছাড়া এখন গায়েও তো শক্তি হয়েছে। তাই সে মনে মনে ভাবল, কি, আমাকে দেখে ভয় পেলি না? দাঁড়া তবে। বলেই সে হাকো হাকো করে চীৎকার করে ছুটল লোকটার দিকে।

এদিকে লোকটা গাধাটাকে প্রথমে বাঘ মনে করেছিল ভয় পেয়ে। এখন তার চিৎকার শুনে লাফিয়ে এল বাইরে,—ওরে, তুই বাঘ নস, গাধা! বলেই সে তক্ষুনি ধনুকে তীর ছুঁড়ে পটাপট মেরে শুইয়ে দিল তাকে। হাকো হাকো করে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তারপর নিশ্চল হয়ে গেল গাধা।

"তাই বলছিলাম বহুদিন যাবৎ খেতে গিয়েই না তা হয়েছিল।"

"থাকগে মহারাজ—" দীর্ঘমুখ তার গল্প আবার বলতে লাগল, "তারপর সেই পাখিরা বলল,—ওহে ধূর্ত বক, তুমি আমাদের দেশে এসে আমাদের রাজাকেই নিন্দে করছ বলেই তারা সবাই মিলে আমাকে ঠোকরতে লাগল। মূর্খ, তোদের রাজা কোমল প্রকৃতির। রাজ্যে তার অধিকার নেই। কোমল প্রকৃতির লোক নিজের হাতের টাকাই রক্ষা করতে পারে না, সে করবে পৃথিবী পালন? তুই তো কূপমণ্ডুক, তাই তার আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছিস। শোন:

ফল ও ছায়াযুক্ত বিরাট গাছকেই আশ্রয় করা উচিত।

দৈবাৎ যদি ফল না-ও থাকে তবে রোদকে নিবারণ করবে।

তোদের রাজা যদি কৌশলীও হয় তবুও কি পারবে আমাদের রাজার সঙ্গে? কথায় আছে:

প্রবল রাজাকেও কৌশলে পরাজিত করে জয়লাভ করা যায়।

চন্দ্রের নামকীর্তন করেই না খরগোসেরা সুখে বাস করছিল।

"আমি বললাম।" দীর্ঘমুখ বলল, "কি রকম?"

"তবে শোন।" পাখিরা বলতে লাগল:

গল্প ঃ চার
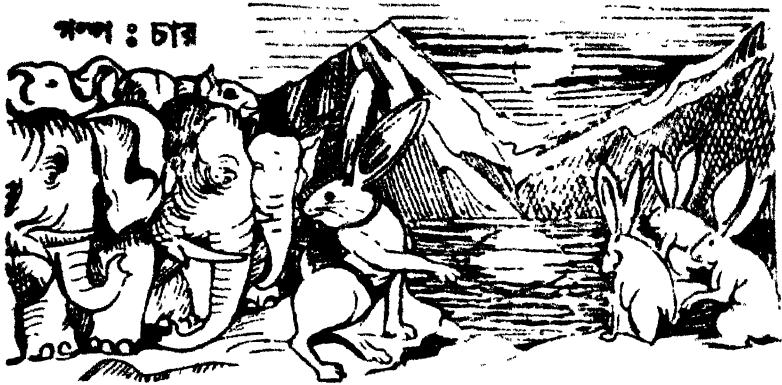
এক বর্ষাকালে চারিদিক রোদে খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মানুষজন পশুপাখি সব বৃষ্টির অভাবে হাহুতাশ করছে। এমন সময় এক হাতির দল জলের অভাবে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। একটি হাতি তাদের দলপতিকে বলল, "প্রভু, চারিদিকে জলের জন্য হাহাকার, আমরা তো আর পারি না।"

দলপতি বলল, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখি কিছু করতে পারি কিনা।" বলে সেই দলপতি তখন তাদের ছেড়ে জলের খোঁজে বেরিয়ে গেল। হাতির দল তাকিয়ে রইল দলপতির দিকে।

যাহোক একটু পরে দলপতি এসে বলল, "পেয়েছি, একটা নির্মল জলের হ্রদ। যদিও ছোট, তবুও এখনকার মত তৃষ্ণা মিটে যাবে। চল যাই।" বলে সে সবাইকে নিয়ে সেখানে গিয়ে জল তোলপাড় করে স্নান ও জলপান করল। তারপর থেকে তারা রোজই যায় সেখানে।

এদিকে হয়েছে কি, এই জলাশয়টার ধারে কতকগুলি খরগোস বাস করত। তারা তো ভয়ে জড়সড়। না হবেই বা কেন? এই বড় বড় হাতির দল যদি আসে তারা যাবে কোথায়? হাতির পায়ের চাপে অনেক খরগোসও মারা গেল।

তখন শিলীমুখ নামে একটা খরগোস সবাইকে ডেকে বলল, "রোজ যে হাতির দল এখানে আসছে তাতে আমাদের তো বংশ নাশ হবে।"

বিজয় নামে একটি খরগোস বলল, "অস্থির হয়ো না। আমি এর প্রতিকার করছি।" বলে সে তক্ষুনি যাত্রা করল হাতির দলপতির কাছে।

সে তো আর একটুখানি পথ নয়। ঘুরতে ঘুরতে সে পর্বতের চূড়ার কাছে গিয়ে দেখা পেল দলপতির। দলপতি তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ?"

বিজয় বলল, "ভগবান চন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।"

"কেন?" দলপতি বলল।

"আমি দূত।" বিজয় বলল, "জানেন তো—

উত্তোলিত শস্ত্রেও দূত অন্য কথা বলে না।

সর্বদা অবধ্য, নিশঙ্ক দূত প্রকৃত কথাই বলে।

আমি তাঁর আদেশ অনুসারেই বলছি। শুনুন, এই খরগোসের দল চন্দ্র সরোবরের রক্ষক। তুমি তাদের বিতাড়িত করে ভাল কাজ করনি। এরা আমার রক্ষক শশক। তাই আমি শশাঙ্ক।

বিজয়ের কথা শুনে দলপতি গেল ভয় পেয়ে। বলল, "আজ্ঞে, আমি তা তো জানি না। যা করেছি অজ্ঞানতাবশতই করেছি। আর কখনও করব না।"

বিজয় বলল, "বেশ, তাই যদি হয় তবে সরোবরে অবস্থিত ভগবান চন্দ্রকে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে সন্তুষ্ট করে এস। আমি রাত্রিবেলা তোমাকে এসে নিয়ে যাব। তৈরি থেক।"

তারপর সেদিনই রাত্রিবেলা বিজয় করল কি, দলপতিকে নিয়ে সরোবরের মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখ, তিনি রাগে কাঁপছেন। প্রণাম করে ক্ষমা চাও।"

দলপতি তো এমনিতেই ঘাবড়ে গিয়েছিল, এখন জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে আরো ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি জলের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, "আমি অজ্ঞানতাবশত অপরাধ করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আর কখনও করব না।" বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল। খরগোসেরা বিপম্মুক্ত হল। তাই বলছিলাম কৌশলের কথা।"

বলে পাখি চুপ করলে আমি বললাম, "আমাদের প্রভু মহাপরাক্রমশালী। রাজ্যের কথা আর কি বলব।"

"কি?" শুনেই তো পাখিরা চিৎকার করে উঠল। বলল: "তুমি বড় উদ্ধত। তুমি আমাদের দেশে কেন এসেছ? চল, তোমাকে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাই।" বলেই তো তারা আমাকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল।

আমাকে দেখেই রাজা জিজ্ঞেস করল, "এ কে? কোথেকে এসেছে?"

তারা বলল, "প্রভু, এ হিরণ্যগর্ভ নামক রাজহাঁসের অনুচর, কর্পূরদ্বীপ থেকে এসেছে। সে আমাদের দেশে এসে আপনার নিন্দে করছে।"

মন্ত্রী শকুনি জিজ্ঞেস করল, "ওহে, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী কে?"

"আমি বললাম—" দীর্ঘমুখ বলতে লাগল, "সকল শাস্ত্রে পারদর্শী চক্রবাক আমাদের প্রধানমন্ত্রী।"

শকুনি বলল, "হুম! উপযুক্তই বটে। সে স্বদেশবাসী। কথায়ই তো আছে:

> স্বদেশজাত, পবিত্রকুলাচার সম্পন্ন, ধর্মাচরণকারী, নির্মলচরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, দ্যূতক্রীড়াদিতে আসক্তিহীন, ব্যভিচার বর্জিত, ব্যবহার শাস্ত্রবেত্তা, বিখ্যাত, সদ্বংশজাত, পণ্ডিত এবং ন্যায়ানুসারে অর্থউৎপাদনকারী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।"

শুকপাখি বলে উঠল, "মহারাজ, কর্পূরদ্বীপ প্রভৃতি জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত। সেখানেও তো আপনারই আধিপত্য।"

রাজা বলল, "হুম্! এরকমই বটে। কথায় আছে না—

রাজা, মাতাল, শিশু, স্ত্রীলোক ও ধনগর্বিত ব্যক্তি এরা
দুর্লভ বস্তু পেতে ইচ্ছে করে। অনায়াসলব্ধ বস্তুর কথা
আর কি বলব?"

"আমি বললাম—" দীর্ঘমুখ বলতে লাগল, "কথা দিয়েই যদি কর্পূরদ্বীপে আপনার আধিপত্য স্বীকৃত হয় তবে মহারাজ জম্বুদ্বীপে আমাদের মহারাজেরও আধিপত্য আছে।"

"কি করে?" শুক বলল।

"কেন যুদ্ধ করে।" আমি বললাম।

রাজা হেসে বলল, "ঠিক আছে, তোমার প্রভুকে গিয়ে বল তৈরি হতে।"

"না মহারাজ, আমি কেন? দূত পাঠান।"

রাজা বললেন, "হুম, দূতই পাঠাব।

রাজভক্ত, বিশ্বাসী, গুণী, সৎচরিত্র, বাকপটু, কর্মনিপুণ,
ক্ষমাশীল, ব্রাহ্মণ, শত্রুর মনোভাব বুঝতে পারে এমন,
প্রতিভাবান লোকই দূত হবেন।"

শকুনি বলল, "এমন লোক তো মহারাজ বহু আছেন, তবে ।"

"না, না, শুকই যাক।" বলে রাজা শুককে আদেশ দিল, "শুক তুমিই এর সঙ্গে গিয়ে আমাদের কথা বল।"

"মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।" শুক বলল, "কিন্তু আমি এর সঙ্গে যাব না। কারণ:

দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গে বাস করা বা যাওয়া কখনই উচিত নয়।
কাকের সঙ্গে একত্র বাস করে হাঁস যেমন নিহত হয়েছিল,
তেমনি দুর্জনের সঙ্গে যাওয়ায়…" "কি রকম?" রাজা বলল।

"তাহলে শুনুন মহারাজ।" শুক বলতে লাগল:

উজ্জয়িনী নগরে যাওয়ার পথে এক প্রান্তরের একটি কোণে বিরাট একটা অশত্থ গাছ ছিল। সেই গাছে এক হাঁস ও এক কাক বাস করত।

এক গ্রীষ্মকালে একদিন এক পথিক যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। দুপুরের রোদে সে ঘেমে নেয়ে সারা। তাই ক্লান্ত হয়ে সে সেই অশত্থ গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পথিকের হাতে ছিল তীরধনুক। সে সেই তীরধনুক তার পাশে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, পথিকের ওঠার নামগন্ধও নেই। সে ঘুমিয়েই রয়েছে। হঠাৎ গাছের উপর থেকে হাঁস দেখল, বেচারা পথিকের মুখে রোদ পড়েছে। হাঁসের তো স্বভাব সুন্দর, তার খুব দয়া হল। সে তাড়াতাড়ি নিজের দুটি পাখা মেলে ধরল যাতে পথিকের মুখে রোদ না পড়ে।

এদিকে কাকটাও সবই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু স্বভাব-দুর্বৃত্তের স্বভাব যাবে কোথায়? সে ভাবছিল কিভাবে সে হাঁসের অনিষ্ট করবে।

পথশ্রমে পথিক এতই ক্লান্ত ছিল যে একটু পরে তার নাক ডাকতে লাগল, মুখ হয়ে গেল হাঁ। কাকটা তখন করল কি, হঠাৎ সে নিচু হয়ে পথিকের মুখে বিষ্ঠা ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। ওয়াক, ওয়াক থু থু করতে করতে ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ল পথিক। উপর থেকেই কিছু পড়েছে বলে সে উপর দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল একটা হাঁস ঠিক তার মাথার উপরে ডানা মেলে বসে রয়েছে। পথিক তো রেগে ছিলই, এখন হাঁসটাকে দেখে সব রাগ গিয়ে পড়ল তার উপর। সে তক্ষুনি তীরধনুক দিয়ে হত্যা করল হাঁসটাকে।

তাই বলছিলাম মহারাজ, দুর্জনের সঙ্গে বাস করা উচিত নয়। কথায়ই তো আছে :

অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করে সাধু সংসর্গ অবলম্বন কর, অহোরাত্র ধর্মানুষ্ঠান কর, আর সংসার অনিত্য, সর্বদা একথা চিন্তা কর।

মহারাজ এই হল দুর্জনের সঙ্গে বাসের কথা। এখন শুনুন দুর্জনের সঙ্গে যাওয়ার কথা।

গল্প ঃ ছয়

এক গাছে একটা কাক থাকত। গাছের নিচে থাকত এক ভরত পক্ষী (ভারুই পাখি)। দুজনের মোটামুটি ভাবসাব ছিল।

একদিন সব পাখিরা ভগবান গরুড়ের আগমন উৎসব উপলক্ষে যাচ্ছিল সমুদ্র তীরের দিকে। এই খবর তো সব পাখিই জানে। তাই কাক ও সেই ভারুই পাখিও চলল উড়ে।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই তারা। হঠাৎ কাক দেখতে পেল, এক গোয়ালা এক হাঁড়ি দই মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। দই দেখে স্বভাব-দুর্বৃত্ত কাকের লোভ জেগে উঠল, দই খাবে। ভারুই পাখির কিন্তু এসব কিছু মনেই আসেনি। স্বভাব-নির্মল ভারুই পাখি এমনিতেও ধীর স্থির, ওড়েও আস্তে—কাকের মত এত চঞ্চল নয় সে।

এদিকে কাক কিন্তু ততক্ষণে ঝট করে এক একবার দইয়ের পাত্রেতে বসে, খপখপ করে দই খায় আর উড়ে উড়ে যায়। গোয়ালা টেরও পায় না। কিন্তু কতক্ষণ আর এরকম চলে। একবার ঠিক টের পেয়ে গেল গোয়ালা। কাক ততক্ষণে চটপট উড়ে পড়েছে

আকাশে। কিন্তু তারই পাখি তো আর এত তাড়াতাড়ি উড়তে পারে না। গোয়ালা দেখে ফেলল তাকে, আর তখন ঢিল ছুঁড়ে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে কতক্ষণ! তাই বলছিলাম, "দুর্জনের সঙ্গে যাওয়াও উচিত নয়।"

"আমি বললাম, মহারাজ," দীর্ঘমুখ বলতে লাগল, "ভাই শুক, আপনি একি বলছেন! আমি দূত, আপনিও তো তাই। প্রভু আমার প্রতি যেমন, আপনার প্রতিও তো তেমনি।"

শুক বলল, "তা হোক। কিন্তু আপনার বাকচাতুর্যেই তো আপনার দুর্জনত্ব প্রমাণিত। এই দুর্জন রাজার যুদ্ধের কারণ তো আপনার কথাই। দেখুন:

প্রত্যক্ষ অপরাধ করলেও মূর্খ চাটুবাক্যে তুষ্ট হয়। যেমন সারথি তার স্ত্রীকে তার ছেলে বন্ধুর সঙ্গে মাথায় করেছিল।"

আমি বললাম, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন।" শুক বলতে লাগল:

গল্প : সাত

শ্রীনগরে মন্দমতি নামে এক সারথি বাস করত। সে জানত, তার স্ত্রী, সে বাইরে চলে গেলে, তার এক ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব করে। সে শুনতই, কিন্তু কোনদিন ধরতে পারত না।

একদিন সে বাইরে যাওয়ার নাম করে গোপনে ঘরে এসে খাটের নিচে বসে রইল। তার ভাগ্য ভাল, সেদিনও তার স্ত্রীর ছেলে-বন্ধু এসেছে। তার স্ত্রী তো তাকে খাটে বসিয়ে খাবার-দাবার নিয়ে গল্পগুজব করছে, সারথি শুনছে সব খাটের নিচে থেকে, আর রাগে ফুঁসছে। সারথি নিজে খুবই বলশালী ছিল। ইচ্ছে করলে সে তখনি দুজনকে ধরে পেটাতে পারত। কিন্তু সে তা না করে ভাবতে লাগল কি করা যায়।

এমন সময় তার স্ত্রী কি একটি হাসির কথা বলে পা দুলিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ খাটের নিচে বসে থাকা স্বামীর গায়ে পা লেগে যেতেই চমকে উঠল। বুদ্ধি তার কম ছিল না। সে বুঝল, তার স্বামী বসে আছে খাটের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে চুপ করে গেল সে।

তার বন্ধুটি বলল, "কি, চুপ করে আছ যে?"

সারথির স্ত্রী বলল, "না, চুপ করলাম কোথায়?"

ভাবলাম, আমার স্বামী আজ কখন কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছে। মানুষটার খাওয়া হল কি না কে জানে? আমি হাসছি বটে, কিন্তু

আমার মন পড়ে রয়েছে তার কাছে। তাকে ছাড়া আমার সবই খারাপ লাগছে।"

তার কথা শুনে তার বন্ধু গেল রেগে। বলল, "তুমি তার কথাই যদি ভাব, তবে আমাকে কেন বলেছিলে যে তোমার স্বামী কলহপ্রিয় ?"

"কি বলব ?" রেগে গেল সারথির স্ত্রী। বলল, "তুমি একটি মূর্খ, না হলে—"

বলাও শেষ করেনি সে, বলশালী সারথি ঝট করে লাফিয়ে উঠল খাটসুদ্ধ তাদের দুজনকে মাথায় করেই। তার কি আনন্দ, তার স্ত্রী এত ভাল আর সে কিনা ঝগড়া করে তার স্ত্রীর সঙ্গে ? খাট মাথায় করে সে নাচতে লাগল। সারথির স্ত্রী আর তার বন্ধু তো থ। নামতেও পারে না খাট থেকে, যেতেও পারে না। সারথি তো তখনও নেচেই চলেছে।

"তাই বলছিলাম—"শুক বলতে লাগল, "মূর্খ চাটুবাক্যতেই তুষ্ট হয়।"

তারপর মহারাজ তাদের রাজা আমার প্রতি দূতের সম্মান দিলে আমিও তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে চলে এলাম। শুক পাখিও আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। এখন যা করবার করুন। বলে দীর্ঘমুখ চুপ করল।

মন্ত্রী চক্রবাক হেসে বলল, "মহারাজ, এই বক নিজের সাধ্য অনুসারে অন্য দেশে রাজকার্য করে এসেছে।" মূর্খদের স্বভাবই তো এই :

পণ্ডিতের উপদেশ হল একশ মঙ্গলজনক কাজ উপেক্ষা করবে,
তবু বিবাদ করবে না, আর বিনা কারণে দ্বন্দ্ব হল মূর্খের
লক্ষণ।"

রাজা বলল, "যাক্, যা হয়েছে তা তো হয়েইছে, তা নিয়ে আর তর্কের দরকার নেই। এখন যুদ্ধের কারণ কি ?"

চক্রবাক বলল, "নির্জনে বলব। কারণ:

মুখরাগ, বহিরাকৃতি, স্বর, নয়নবিকৃতি, মুখবিকৃতি, মনোভাব জ্ঞানীরা তর্কদ্বারা জানতে পারেন। অতএব বিজনে মন্ত্রণা করা উচিত।"

তারপর রাজা মন্ত্রী ছাড়া সবাই রাজসভা থেকে উঠে গেল। তখন চক্রবাক বলল, "প্রভু, আমি জানতে পেরেছি আমাদের কোন অনুচরের প্রেরণাতেই বক এসব করেছে। শাস্ত্রেই তো আছে:

রোগী বৈদ্যদের লাভজনক, বিপন্ন প্রভুরা মঙ্গলজনক, মূর্খরা বিদ্বানদের জীবনস্বরূপ, কলহপ্রিয় প্রজারা রাজার জীবন।"

রাজা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। কারণ নয়ত পরে স্থির কর। এখন কর্তব্য কি বল?"

চক্রবাক বলল, "তাহলে আপনি সেখানেও চর পাঠান। তখন আমরা জানতে পারব, ওই রাজা কি চায়, তার শক্তি আর সামর্থ্যই বা কতটুকু। মহারাজ—

নিজের ও পরের রাজ্য সম্বন্ধে কি করণীয়, কি করণীয় নয়, তা জানবার জন্য গুপ্তচরই রাজার চক্ষুস্বরূপ। যার গুপ্তচর নেই তিনি অন্ধতুল্য—অর্থাৎ নিজের কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম।

তাহলে মহারাজ সে আবার দ্বিতীয় আরেকজন বিশ্বাসভাজনকে নিয়ে তার সঙ্গে সেই রাজা সম্বন্ধে মন্ত্রণা দিয়ে চলে যাক। কারণ কথায়ই তো আছে:

শাস্ত্র আলোচনা করবার ছলে তীর্থস্থানে, তপোবনে ও দেবালয়ে তপস্বীবেশধারী গুপ্তচরের কাছে পর-রাজ্যের বিষয় জানবে।

মহারাজ, গুপ্তচররা জলে ও স্থলে বিচরণ করে। যাহোক এই বককেই তাহলে নিয়োগ করুন, আর তার সঙ্গে যাক দ্বিতীয় আরেক বক। সেই অবসরে দূতের পরিবারকে রাজদ্বারে নিয়ে আসুন। কেউ যেন না টের পায়। কারণ:

নীতিবিদদের মত হল মন্ত্রণা প্রকাশ হয়ে গেলে যে বিপদ হয়

রাজারাও তা দূর করতে সমর্থ হন না।"

রাজা বলল, "তাহলে আমি ভাল দূত পেয়েছি বল ?"

মন্ত্রী বলল, "তাহলে আমাদের যুদ্ধ জয়ের আর বাকি কি ?"

এমন সময় দৌবারিক এসে বলল, "মহারাজ জম্বুদ্বীপ থেকে শুক এসেছেন।"

রাজা মন্ত্রীর দিকে তাকাতেই মন্ত্রী বলল, "ঠিক আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে দূতগৃহে রাখ। পরে দেখা হবে।"

দৌবারিক চলে গেলে রাজা বলল, "মন্ত্রী, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ?"

"না-না, মহারাজ।" মন্ত্রী বলল, হঠাৎ যুদ্ধকরা শাস্ত্রসম্মত নয়।
পূর্বে আলোচনানা-করেই যে রাজাদের যুদ্ধোদ্যোগ, রাজ্যত্যাগ বা
পলায়ন করতে উপদেশ দেয় সে অনুপযুক্ত অনুচর এবং মন্ত্রী।
যেখানে দেখা যায় যুযুধান দুই পক্ষের জয় অনিশ্চিত, সেখানে
যুদ্ধে শত্রুকে পরাভূত করার চেষ্টা কখনও করা উচিত নয়।
যুগপৎ সাম, দান ও ভেদ দিয়ে অথবা পৃথকভাবে শত্রু জয়
করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু যুদ্ধ দিয়ে কখনও নয়।
যুদ্ধে বর্তমান না থেকে সবাই নিজেকে বীর বলে মনে করে।
শত্রুর সামর্থ্য না জেনে কে না গর্বিত হয় ?
আর যন্ত্রণার কথা কি বলব মহারাজ—
যথাকালে হলকর্ষণ কর্মের চেষ্টা করলে যেমন কৃষিকার্যে
সুফল পাওয়া যায়, হে রাজন ! তেমনি রাজনীতি বহুকাল
পরে সিদ্ধ হয়, অল্পকালে ফল পাওয়া যায় না।
জ্ঞানী ব্যক্তির গুণ হল ভয়ের কারণ আসন্ন হলে পরাক্রম
প্রদর্শন করা। স্থিতধী পুরুষ বিপদ উপস্থিত হলে ধৈর্য
অবলম্বন করেন।
কাল না হলে যে শত্রুজয়ের চেষ্টা করে সে মূর্খ। বলশালীর
সঙ্গে যুদ্ধ পিঁপড়ের পাখা ওঠার মত।

নির্লজ্জ ব্যক্তি কচ্ছপের মত নিশ্চেষ্ট থেকে শত্রুপীড়নও সহ্য করেন, কিন্তু সময় এলে ক্রুর ব্যক্তির মত প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন।

অতএব, মহারাজ, যে পর্যন্ত না আমাদের দুর্গ সজ্জিত হয় ততদিন পর্যন্ত শুককে এখানে রেখে দিতে হবে। কারণ :

দুর্গাশ্রয়বিহীন রাজা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শত্রু কার না পরাভবস্থানীয় হয়? দুর্গবিহীন ও আশ্রয়হীন রাজা সমুদ্রে পোতভ্রষ্ট মানুষের মত।

তবে দুর্গ তৈরিরও নিয়ম আছে।

বিস্তৃত, গভীর পরিখাবেষ্টিত, উচ্চপ্রাকার সংযুক্ত, যন্ত্রোপযোগী অস্ত্রাদিসহ, পানীয় জলযুক্ত, পর্বত, নদী, মরুস্থান, বনবেষ্টিত এরূপ স্থানেই দুর্গ নির্মাণ করা উচিত।

দুর্গ নির্মাণ করলেই হয় না মহারাজ। তার মধ্যে কিছু জিনিসও রাখতে হবে। যেমন :

বিস্তীর্ণ, অত্যন্ত উঁচু-নিচু, জলাশয়যুক্ত, ধানক্ষেতযুক্ত, মাঠ, প্রবেশ ও বহির্গমন পথ এই সাতটি দুর্গের সম্পদ।

রাজা বলল, "দুর্গের স্থান নির্ণয় করবে কে?"

"আজ্ঞে—।" চক্রবাক বলল :

যে যে-কাজে দক্ষ তাকে সেই কাজেই নিয়োগ করা উচিত। যে যে-কাজে অনভিজ্ঞ সে বিদ্বান হলেও কার্যকালে সে কর্তব্যবিমূঢ় হয়।"

"তাহলে সারসকে ডাক।" রাজা বলল।

খবর পেয়েই সারস এসে উপস্থিত।

রাজা বলল, "সারস, তুমি এক কাজ কর। একটা দুর্গ অনুসন্ধান কর তো।"

সারস বলল, "মহারাজ, এ তো ঠিকই আছে। এই সরোবরটাই তো দুর্গরূপে নির্দিষ্ট। শুধু মধ্যদ্বীপে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ :

হে রাজন : সব সঞ্চয়ের মধ্যে ধানই শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। মুখে ধন
প্রদান করলেও প্রাণ রক্ষা করা যায় না।
আর সকল রসের সেরা লবণ। সেই লবণ সংগ্রহ করা উচিত।
কারণ তা ছাড়া সকল ব্যঞ্জন গোময়তুল্য বিস্বাদ।"

রাজা বলল, "তাহলে যাও, গিয়ে সব ঠিক কর।"

এমন সময় এক শাস্ত্রী এসে বলল, "মহারাজ, সিংহল দ্বীপ থেকে এক কাক এসেছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

রাজা বলল, "কাক বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী। তাহলে তাকে আমাদের পক্ষে নিযুক্ত করা উচিত।"

চক্রবাক বলল, "মহারাজ, আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ কাক স্থলচর। তাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে? কারণ :

যে আত্মপক্ষ পরিত্যাগ করে শত্রুপক্ষে অনুরক্ত থাকে সে
মূর্খ নীলবর্ণ শৃগালের মত শত্রু কর্তৃক নিহত হয়।"

রাজা বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন মহারাজ।" বলে মন্ত্রী বলতে লাগল :

গল্প : আট

শেয়াল তো বনেই থাকে। একদিন এক শেয়াল ঘুরতে ঘুরতে এক শহরে এসে একজন ধোপার নীলজলে পূর্ণ পাত্রটা দেখতে গিয়ে তার মধ্যে পড়ে যায়। পাত্রটা ছিল বেশ গভীর। কিছুতেই সে উঠতে পারছিল না। কিন্তু বুদ্ধি তার কম ছিল না। সে করল কি, মাথাটা জাগিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল পাত্রতে। রাত্রিবেলায় সে এসেছিল শহরে। কাজেই ধোপা জানতেও পারেনি, শেয়ালটা যে তার নীলের পাত্রতে পড়ে রয়েছে।

পরদিন ধোপা সকাল বেলায় নীলের পাত্রতে শেয়ালটাকে দেখে তো থ। তারপর যখন দেখল সে নড়েও না, চড়েও না, ধোপা ভাবল, যেমন কর্ম তেমন ফল। বেটা নীলজলে খাবার খেতে এসেছে? খা বেটা, খা। বলে সে শেয়ালটাকে একটা খোঁচা দিয়ে বুঝল সে মরে গেছে। তারপর সে তাকে পাত্র থেকে তুলে নিয়ে বনের ধারে ফেলে দিয়ে এল।

আসলে শেয়ালটা তো জীবিতই ছিল : সে করল কি, ধোপা চলে যেতেই সে এক দৌড়ে চলে গেল বনে।

বনে তো গেল সে, কিন্তু পড়ল মুশকিলে। তার স্বজাতীয়েরা যদি

তাকে তাড়িয়ে দেয়? কিন্তু বুদ্ধি থাকলে সব হয় সে মনে মনে একটা বুদ্ধি ঠিক করে সোজা গিয়ে স্বজাতীয়দের বলল, "দেখেছ আমার গায়ের রঙ! বনদেবী নিজের হাতে আমাকে সাজিয়ে দিয়ে তোমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন।"

তার গায়ের নীল রঙ দেখে তার স্বজাতীয়রা থতমত খেয়ে গেল। ভাবল, হবেও বা।

তারপর থেকে সেই শেয়াল তাদের রাজা হয়ে রাজত্ব করে। ক্রমে তার আধিপত্যও বাড়ল। বনের সব পশুরাই থতমত খেয়ে তাকে রাজা বলে মেনে নিয়েছে এখন তার স্বজাতীয়রা আর তার কাছে আড্ডা জমায় না। তার পাত্র-মিত্র-সভাসদ এখন সবই বাঘ, ভালুক, সিংহ। তাতে তার স্বজাতীয়রা গেল চটে। তখন এক বৃদ্ধ শেয়াল তাদের বলল, "দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।" বলে সে সবাইকে আদেশ করল, "আজ সন্ধ্যেবেলা যখন রাজদরবার বসবে, পাত্র-মিত্র-সভাসদ সবাই থাকবে, তখন তোমরা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠবে। সে তো আমাদেরই স্বজাতীয়। সেও তখন চিৎকার করে উঠবে। তাতে সবাই বুঝবে, সে শেয়াল। তারপর যা হবে বুঝতেই পারছ।"

"কাজেও তাই হল মহারাজ।" মন্ত্রী বলতে লাগল, "সন্ধেবেলায় যেই না সব শেয়াল চিৎকার করে উঠেছে, সেও উঠল চিৎকার করে। ব্যস্, আর যায় কোথায়? বাঘ-সিংহ বুঝল, সে তো রাজা নয়, সে একটা শেয়াল। তারা তখন সবাই মিলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

মহারাজ আত্মীয় যদি শত্রু হয়, তবে সে ছিদ্র, গুপ্তরহস্য যা
বল সবই জানতে পারে। বনের অভ্যন্তরীণ দাবানল সব
গাছকেই শুকনো গাছের মত ভস্মীভূত করে।
তাই বলছিলাম আত্মপক্ষ পরিত্যাগ করার কথা।"

রাজা বললেন, "তাহলে তাকে একবার দেখা যাক। অনেক দূর থেকে এসেছে সে। তাকে যদি আমাদের পক্ষে আনতে পারি।"

চক্রবাক বলল, "তাহলে মহারাজ আমাদের দূতও চলে গেছে, দুর্গও সুসজ্জিত। এখন শুককে আনা যেতে পারে। সে আমাদের শক্তি দূর থেকেই দেখে যাক। কারণ—

কৌটিল্য তীক্ষ্নবুদ্ধি দূত প্রয়োগ করেই নন্দকে নিহত করেছিলেন। তাই যোদ্ধাবেষ্টিত হয়ে রাজার দূর থেকেই দূতকে দেখা উচিত।

তারপর সভায় শুক ও কাককে আনা হল।

শুক উন্নত মস্তকে আসনে বসেই বলল, "ওহে হিরণ্যগর্ভ, তোমাকে আমাদের মহারাজাধিরাজ চিত্রবর্ণ আদেশ দিয়েছেন, রাজ্য ও জীবনের যদি প্রয়োজন থাকে তবে তুমি শীঘ্র এসে আমার পদবন্দনা কর। না হলে এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।"

"ব্যস, ব্যস।" চিৎকার করে উঠলেন রাজা হিরণ্যগর্ভ। চারিদিক তাকিয়ে বললেন, "এখানে কি এমন কেউ নেই যে এটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বার করে দেয়?"

চট করে লাফিয়ে উঠল কাক মেঘবর্ণ। বলল, "আদেশ করুন মহারাজ, আমি এই শুককে হত্যা করি?"

সর্বজ্ঞ লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "না ভদ্র, শান্ত হন।" বলে সে রাজা ও কাককে শান্ত করে বলল, তবে শুনুন—

যে সভাতে বৃদ্ধ নেই সে সভা সভাই নয়। যে বৃদ্ধ ধর্ম কথা বলে না সে বৃদ্ধ বৃদ্ধই নয়। যে ধর্মে সত্য নেই সে ধর্ম ধর্মই নয়। যে সত্য সংশয়যুক্ত সে সত্য সত্যই নয়।

কে দূতের কথায় নিজের হীনতা ও শত্রুর শ্রেষ্ঠতা মনে করে? অবধ্য বলেই দূত সর্বদা নানা কথা বলে।

তারপর রাজা ও কাক শান্ত হল। আর এদিকে শুকও রাজদরবার ছেড়ে উঠে চলে গেল। কিন্তু চক্রবাক তো মন্ত্রী, সব দিকেই তার নজর রাখতে হয়। সে করল কি, শুককে নানান উপহার দিয়ে তার দেশে পাঠিয়ে দিল।

শুক সেখান থেকে গিয়ে সোজা রাজদরবারে উপস্থিত।

রাজা চিত্রবর্ণ তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সংবাদ শুক? সে দেশ কেমন?"

শুক বলল, "মহারাজ, কি বলব? কর্পূরদ্বীপ স্বর্গতুল্য, আর সেখানকার রাজাও তার দ্বিতীয় অধিপতি।"

রাজা খুব খুশি বলে মনে হল না। রাজা সবাইকে ডেকে বললেন, "বর্তমানে যা করা কর্তব্য তা হল যুদ্ধ।"

তার মন্ত্রী ছিল শকুনি। সে বলল, "যুদ্ধ করবেন, কিন্তু যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করবেন না।

যখন রাজারা থাকেন মিত্রভাবাপন্ন, মন্ত্রী ও আত্মীয়েরা অবিচলিত অনুরাগী, আর শত্রু থাকে প্রতিকূল তখন যুদ্ধ করা বিধেয়।

রাজা, মিত্র ও স্বর্ণ এই তিনটিই হল যুদ্ধের ফল। এগুলি যখন নিশ্চিত হবে তখন যুদ্ধ করা বিধেয়।"

রাজা বললেন, "তুমি আমার শক্তি জানো। যাহোক দৈবজ্ঞ ডাক। যুদ্ধের সময় ঠিক করুন।"

মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, তবুও হঠাৎ যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে না। কারণ—

সহসা কাজ আরম্ভ করা দোষের। যে মূর্খ শত্রুর শক্তি বিচার না করে সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই মূর্খ নিশ্চয়ই অস্ত্রের ধার (আলিঙ্গন) লাভ করে।"

রাজা বললেন, "আঃ মন্ত্রী, তুমি আমার উৎসাহভঙ্গ কর না তো! জয়লাভের জন্য কিভাবে পররাজ্য আক্রমণ করতে পারি তা বল।"

মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, বলছি শুনুন—

রাজা যদি শাস্ত্রানুসারে কাজ না করেন তবে মন্ত্রণাতে কি লাভ? ঠিকমত ঔষধ প্রয়োগ না করলে রোগের শান্তি কখনও হয় না।

তবে রাজার আদেশও লঙ্ঘন করা যায় না। যথাশাস্ত্রই আমি বলছি, শুনুন—

রাজাদের যেখানে নদী, পর্বত, বন ও দুর্গের ভয় আছে সেখানে যথাশাস্ত্র সেনানীব্যূহ বিন্যস্ত করে সেনাপতি যুদ্ধে যাবেন। বীরপ্রধানদের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ সামনে যাবেন, মধ্যে থাকবে স্ত্রীলোক, রাজা, রাজকোষ, হীনবল ব্যক্তিগণ ও সৈন্য। উভয় পার্শ্বে থাকবে অশ্বারোহী সৈন্য, তাদের পার্শ্বে রথ, রথের পার্শ্বে হস্তী, হস্তীর পার্শ্বে থাকবে পদাতিক সৈন্য। তার পেছনে সেনাপতি শ্রান্ত সৈনিকদের আশ্বাস দিতে দিতে যাবেন ধীরে ধীরে। পেছনে অমাত্যরা, নিপুণ যোদ্ধার দলের সঙ্গে রাজা নিয়ে যাবেন সৈন্য।

উঁচুনিচু বন্ধুর স্থানে, জলাকীর্ণ প্রদেশে, পর্বতে যাবে হস্তীসৈন্য। সমতলে যাবে অশ্বারোহীরা, নদীতে নৌ-সৈন্য আর সর্বত্র পদাতিক। কথিত আছে—

বর্ষাকাল হস্তীসৈন্য গমনের পক্ষে প্রশস্ত, গ্রীষ্মকাল প্রশস্ত অশ্বারোহীর জন্য, আর সর্বকাল পদাতিকের জন্য।

হে রাজন! পর্বত ও দুর্গপথ আত্মরক্ষার্থে রক্ষা করা কর্তব্য। নিজের যোদ্ধৃপুরুষেরা রক্ষা করতে থাকলেও রাজা প্রগাঢ় নিদ্রা না নিয়ে আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করবেন।

দুর্গবন্ধক শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে সেনানিবাসের শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করবে। শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করবার সময় অরণ্যচারী যোদ্ধৃপুরুষ ভীল, কিরাত প্রভৃতি সৈনিক অগ্রবর্তী হবে। যেখানে রাজা সেখানেই কোষাগার, বিনা কোষাগারে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। তারপর সুদক্ষ যোদ্ধাদের ধন দান করবে। দাতার জন্য কে না যুদ্ধ করবে?

হে রাজন! কোন মানুষ মানুষের অধীন নয়, মানুষ অর্থের দাস অর্থের জন্য মানুষ সম্মান পায় বা হীন হয়।

সৈনিকেরা মিলিত হয়েই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করবে। আর হীনবল সৈন্য ব্যূহমধ্যে সন্নিবেশিত করবে।

রাজা পদাতিক সৈন্যকে সৈনিকদের সামনে যোজনা করবেন ও শত্রুরাজ্যে উপদ্রব সৃষ্টি করবেন।

সমতলে রথ ও অশ্বদ্বারা, জলাকীর্ণ স্থানে নৌকা ও হস্তী দ্বারা, তরুলতা আচ্ছন্ন স্থানে ধনুর দ্বারা ও অন্যত্র অসি-চর্ম-আয়ুধের দ্বারা যুদ্ধ করবে।

শত্রুর ঘাস, অন্ন, জল ও রন্ধনকাষ্ঠ সর্বদা দূষিত করবে আর জলাশয়, প্রাচীর ও পরিখাগুলি বিনষ্ট করবে।

রাজার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকদের মধ্যে হস্তীই শ্রেষ্ঠ। অন্যগুলি সেরূপ নয়। কথিত আছে, হস্তী নিজেই অষ্টবিধ অঙ্গের দ্বারা সজ্জিত: যথা—চারটি পা, দুটি দাঁত, শুঁড় ও লেজ।

অশ্বই হল সৈন্যদের মধ্যে গমনশীল প্রাচীরস্বরূপ। সেই অশ্ববল যে রাজার বেশি আছে তিনিই স্থলযুদ্ধে বিজয়ী হন।

চতুরঙ্গ সেনারক্ষণ হল যুদ্ধনৈপুণ্যের মুখ্য। চারিদিকের আগমন নির্গমন পথ নির্বিঘ্নে রাখাই পণ্ডিতকর্ম বলে নীতিশাস্ত্রে বলা আছে।

প্রকৃত বীর অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, রাজার প্রতি অনুরক্ত, কষ্টসহিষ্ণু এবং জ্ঞানীরা বলেন, বীরত্বে খ্যাত ক্ষত্রিয়বহুল সৈন্যই শ্রেষ্ঠ।

হে রাজন! পৃথিবীতে প্রভুদত্ত সম্মানাদি লাভ করে সৈনিক পুরুষ যেরূপ যুদ্ধ করে বহু ধন দান করলেও তারা সেরূপ যুদ্ধ করে না।

প্রভূতবলশালী অল্পসংখ্যক সৈন্য ভাল। কিন্তু দুর্বল অধিক-সংখ্যক সৈন্য ভাল নয়। কারণ দুর্বল সৈন্যেরা পলায়ন করলে বলশালীদেরও উৎসাহ ভঙ্গ হয়।

নিজের সৈন্যের প্রতি অপ্রসন্ন হলে, সৈন্যমধ্যে অবস্থান না করলে, বেতন না দিলে, লুণ্ঠনপ্রাপ্ত ধন আত্মসাৎ করলে, কালক্ষেপ করলে, বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকলে সৈন্যদের বিরক্তির কারণ হয়।

বিজয়েচ্ছু রাজা নিজের সৈন্যপীড়ন না করে শত্রুসৈন্যের প্রতি অভিযান করবেন। দীর্ঘপথ পর্যটনে ক্লান্ত শত্রুকে অনায়াসে বিনাশ করতে পারবেন।

যেহেতু শত্রুর জ্ঞাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নেই, সেহেতু শত্রুর জ্ঞাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।

রাজপুত্র বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করে নিশ্চিন্ত অভিযুক্ত শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ করা উচিত।

যুদ্ধে বিরাম দিয়েও কপট মিত্রভাবাপন্ন রাজাকে বিনাশ করবে। অথবা গরুর গলার দড়ি ধরে টেনে আনবার মত বিপক্ষের প্রধানকে আকর্ষণ করে বশীভূত করবে।

বিজয়েচ্ছু রাজা শত্রুরাজ্য থেকে লোক এনে নিজের রাজ্যে বাস করাবেন অথবা ধন সম্মান দান করে বাস করাবেন, এতে নিজের রাজ্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন হবে। আর বেশি বলে কি হবে—

নিজের উন্নতি আর শত্রুর হানি এ দুটিই নীতি। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ দুটি স্বীকার করে বাগ্মীতা প্রকাশ করেন।'

রাজা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, সবই ঠিক। যাও দৈবজ্ঞের কাছ থেকে সময় জেনে এস।" বলে রাজদরবার ভঙ্গ করে রাজা চলে গেলেন।

ওদিকে সেই যে হিরণ্যগর্ভের গুপ্তচর দূত নিয়ে গিয়েছিল, সে করল কি, সেই গুপ্তচরকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল।

গুপ্তচর এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, রাজা চিত্রবর্ণ প্রায় এসে পড়েছেন। মলয় পর্বতে তিনি শিবির স্থাপন করেছেন।

সেখানে দুর্গ সংস্কার ও পর্যবেক্ষণ করছেন। রাজা চিত্রবর্ণের প্রধানমন্ত্রী শকুনি। খবর পেয়েছি, তিনি এর মধ্যেই আমাদের দুর্গমধ্যে কারুকে নিযুক্ত করেছেন।"

"বল কি?" লাফিয়ে উঠল মন্ত্রী চিত্রবাক। বলল, "তাহলে মহারাজ, নিশ্চয়ই সেই কাক।"

"না না, কি যে বল?" রাজা বললেন, "তাহলে সে শুককে নির্বাচন করতে যাবে কেন? আর শুক আসার পরেই না যুদ্ধ করতে তার খুব উৎসাহ।"

"তাহলেও মহারাজ আগন্তুককে সন্দেহ করা উচিত।" চিত্রবাক বলল।

"না না, তা কেন?" রাজা বললেন, জান না—

শত্রু হিতকারী মিত্র হয়, আবার হিতকারী মিত্রও অহিতকারী শত্রু হয়। দেহের রোগ ক্লেশকর, কিন্তু বনজাত ঔষধ স্বাস্থ্যকর।

রাজা শূদ্রকের বীরবর নামে এক কর্মচারী ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে তার নিজের ছেলেকে দান করেছিল।"

"কি রকম মহারাজ?" চিত্রবাক বলল।

"তাহলে শোন।" রাজা বলতে শুরু করলেন :

গল্প : নয়

বহুদিন আগে আমি যখন রাজা শূদ্রকের ক্রীড়াসরোবরে খেলা করতাম তখনই ঘটনাটা আমার কানে এসেছিল।

একদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন। কোন দেশের এক রাজপুত্র হঠাৎ রাজসভায় এসে রাজাকে অভিবাদন করে বলল, "মহারাজ, আমি এক কর্মপ্রার্থী। যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে তবে দয়া করে আমায় রাখুন।"

রাজা বললেন, "রাখব তো, কিন্তু তুমি কি চাও?"

সেই রাজপুত্র বলল, "আজ্ঞে, আমার বেতন প্রতিদিন চারশ মুদ্রা।"

রাজা কি ভেবে বললেন, "এত বেতন যে চাও, তা তোমার অস্ত্র কি, আর তোমার নামই বা কি?"

রাজপুত্র বলল, "আজ্ঞে, আমার নাম বীরবর। আমার অস্ত্র হল—" বলে সে তার হাত দুখানি ও তার কোমরের তলোয়ার দেখিয়ে বলল, "আমার এই হাত দুটি ও এই তলোয়ার।"

রাজা বললেন, "এই তোমার অস্ত্র, আর তুমি চাও প্রতিদিন চারশ মুদ্রা?" বলেই তিনি মাথা নাড়লেন। "না, আমি সমর্থ নই।"

"আজ্ঞা মহারাজ।" বলে বীরবর মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল।

মন্ত্রীরা রাজাকে বললেন, "মহারাজ, একে বরং চারদিনের জন্য রেখে তার স্বভাব জানুন। তারপর উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করবেন।"

রাজা তখন তাকে ডেকে তার হাতে পান দিয়ে তাকে নিযুক্ত করলেন। পান কেন দিলেন জানেন তো—

তাম্বূল (অর্থাৎ পান) কটু, তিক্ত রসযুক্ত মধুর, ক্ষার ও কষায় রসযুক্ত, বাত উপশমকারী, শ্লেষ্মা ও কৃমিনাশক, দুর্গন্ধ নাশক, অধররঞ্জক, মলদোষ নাশক, কামোদ্দীপক ও ক্ষুধাবর্ধক। হে বন্ধু, তাম্বুলের এই তেরটি গুণ স্বর্গেও দুর্লভ।

যাহোক বীরবর তো কাজে লেগে গেল, কিন্তু রাজা লক্ষ্য করতে লাগলেন, বীরবর টাকাটা কি ভাবে খরচ করে। রাজা তার ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলেন। দেখেন কি, বীরবর রোজ যে চারশ মুদ্রা পায় তার অর্ধেক অর্থ সে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের দান করে। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক মুদ্রা দরিদ্রদের দেয়, আর বাকি অর্ধেক নিজের ভরণপোষণের জন্য রাখে। তারপর প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে তলোয়ার নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রহরীর কাজ করে। সমস্ত দিন কাজ করে রাজা আদেশ করলে বাড়ি ফিরে যায়।

এভাবেই চলছিল দিন। হঠাৎ একদিন এক কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রাত্রিবেলা রাজা শোনেন, কে একজন স্ত্রীলোক করুণ সুরে বিলাপ করে কাঁদছে। রাজা তক্ষুণি বীরবরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "বীরবর, কে কাঁদছে খবর নাও দেখি।"

"যথা আজ্ঞা মহারাজ।" বলে বীরবর তক্ষুণি ছুটে বেরিয়ে গেল।

বীরবরও চলে গেছে, হঠাৎ রাজার মনে হল, রাত্রে বীরবরকে একা পাঠালাম, কাজটা ভাল হল না তো? না, আমাকে গিয়েই দেখতে হচ্ছে।

তারপর রাজাও একটা তলোয়ার নিয়ে চললেন বীরবরের পেছন পেছন। বীরবর কিন্তু টেরও পেল না। সে যেতে যেতে নগরের বাইরে গিয়ে দেখে, অপূর্ব রূপময়ী অলঙ্কারে ভূষিতা এক নারী এক জায়গায় বসে কেঁদেই চলেছে।

বীরবর গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মা, আপনি কে? কাঁদছেনই বা কেন?"

রূপসী বললেন, "আমি এ রাজ্যের রাজা শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী। আমি বহুদিন এখানে ছিলাম, কিন্তু আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে রাজা মারা যাবেন। তাই আমি আর থেকে কি করব? তাই কাঁদছি।"

বীরবর বলল, "এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই মা?"

রাজলক্ষ্মী বললেন, "উপায় থাকবে না কেন? কিন্তু তুমি কি তা পারবে? বত্রিশ লক্ষণযুক্ত তোমার পুত্র শক্তিধরকে যদি ভগবতী সর্বমঙ্গলা দেবীর নিকট বলি দিতে পার তবে রাজা একশ বছর বাঁচবে, আর আমিও থাকব।" বলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বীরবর কি আর তারপর দেরি করে? সে তক্ষুনি বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেকে জাগিয়ে সব কথা বলল। তার ছেলে তো তক্ষুনি উঠে বলল, "বাবা, চলুন। আর দেরি করছেন কেন? এমন সুযোগ কি আর আসবে? আপনি তো জানেন—

প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি ধন ও জীবন পরার্থে দান করেন। মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন তা সৎকাজে দান করাই শ্রেয়।

তার স্ত্রী বলল, "প্রভু, এ যদি না করা হয়, তবে রাজার দেওয়া বেতনই তো পরিশোধ হবে না।"

"তাহলে চল।" বলে বীরবর সবাইকে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা করে বলল, "দেবী প্রসন্ন হন, রাজার জয় হোক।" বলেই সে তার নিজের ছেলের শিরচ্ছেদ করল। তারপর সে ভাবল, রাজার বেতন তো পরিশোধ হল, কিন্তু পুত্রহীন জীবন তো বৃথা। বলে তক্ষুনি নিজের গলায় তরবারী বসিয়ে দিল। হায়,

হায়, করে উঠল তার স্ত্রী। কিন্তু সে-ও তখন স্বামী-পুত্র ছাড়া জীবন বৃথা বলে তরবারী নিয়ে বসিয়ে দিল তার গলায়।

রাজা তো এসব দেখেশুনে অবাক! এমন লোকও পৃথিবীতে আছে! ভাবলেন—

আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মায় ও মরে, কিন্তু এর মত লোক
অতীতে জন্মায়নি ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

তাহলে আমার জীবন রেখে লাভ কি? রাজ্যেরও কি প্রয়োজন? এই বলে তিনিও তরবারী নিজের গলায় বসাতে যাবেন দেবী সর্বমঙ্গলা তার সামনে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, "ক্ষান্ত হও বৎস। আমি তোমার সাহসে মুগ্ধ হয়েছি। বল, তুমি কি চাও?"

"মা, মাগো!" রাজা সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে বললেন, "আমি ধন চাই না, রাজ্য চাই না। যদি তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে স্ত্রীপুত্র সহ এই বীরবরের প্রাণ দান কর।"

দেবী বললেন, "ভৃত্যের প্রতি তোমার এই ঔদার্যে আমি খুব খুশি হয়েছি। যাও, তুমি বিজয়ী হও।" বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বীরবর তারপর স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে প্রাণ পেয়ে বাড়ি চলে গেল। আর রাজাও অলক্ষিতে চলে গেলেন প্রাসাদে।

তার পরদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বীরবর বলল, "মহারাজ, আপনার আদেশে ছুটে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।"

রাজা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, এ তো নিজের প্রশংসা করছে না! বুঝলেন—

অকৃপণ বলে মধুর খাদ্য, বীর নিজের প্রশংসা করে না, দাতা
সৎপাত্রে দান করে এবং সাহসী হয় দয়ালু—

অতএব, "মন্ত্রী" রাজা বলতে লাগলেন, "আগন্তুক মাত্রই কি দুষ্ট হয়?"

চক্রবাক, বলল, মহারাজ—

রাজাকে তোষণ করবার জন্য যে মন্ত্রী অ-কাজকে কাজ বলে উপদেশ দেয় সে নিন্দনীয় মন্ত্রী। রাজার মনে দুঃখ দেওয়া বরং শ্রেয়, অ-কাজ করে তার নাশ করা উচিত নয়।

যে রাজার চিকিৎসক, গুরু এবং মন্ত্রী প্রভুর চিত্তবিনোদনের জন্য প্রিয় বাক্য বলে, সে রাজা শীঘ্রই শরীর, ধর্ম ও ধন হতে বিচ্যুত হন।

তাই বলছিলাম—

পুণ্যবশত একজন যা লাভ করেছে তা আমারও লাভ হবে এই লোভে ধনাকাঙ্ক্ষী এক নাপিত এক ভিক্ষুককে হত্যা করে নিজে নিহত হয়েছিল।

রাজা বললেন "কি রকম ?"

"তাহলে শুনুন।" চিত্রবাক বলতে লাগল :

গল্প : নয়

অযোধ্যা নগরে চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্রিয় ছিল। সে ছিল অত্যন্ত গরিব। তাই সে ধনের জন্য দীর্ঘকাল ভগবান মহাদেবের আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল। তারপর ক্ষত্রিয়ের পাপক্ষয় হওয়ায় ভগবানের আদেশে যক্ষেশ্বর কুবের তাকে রাত্রে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন—তুমি কাল সকাল বেলায় মুখ-হাত না ধুয়ে একটা লাঠি হাতে গোপনে বাড়ির দরজায় লুকিয়ে থাকবে। তারপর একটি ভিক্ষুক যখন তোমার বাড়ির দরজায় আসবে তখন তাকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। সেই ভিক্ষুকই তখন এক কলসী সোনার মোহরে রূপান্তরিত হবে। তাহলে তুমি যাবজ্জীবন সুখী হবে।

তার পরদিন ঠিক তাই হল।

সকালবেলার এই ঘটনাটা কিন্তু একটা নাপিত দেখেছিল।

সে ভাবল, আরে, এভাবে যদি সোনার মোহর ভর্তি কলসী পাওয়া যায় তবে আমিও বা করি না কেন? তারপর থেকে সে

রোজ একটা লাঠি নিয়ে গোপনে ভিক্ষুকের অপেক্ষায় থাকত। একদিন পেয়েও গেল সে। পেয়ে কি আর সে দেরি করে? খটাখট্ করে পিটিয়ে তাকে শুইয়ে ফেলল। কিন্তু কোথায় সোনার মোহর, কোথায় বা কি? রাজার শান্ত্রী এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর যা হয়, তাদের মারের চোটে ঘুচে গেল তার সব। তাই বলছিলাম, মহারাজ পুণ্যের ফল না থাকলে কি আর—

রাজা বললেন, "অতীতের উপাখ্যান বলে কি আর বোঝা যায়, কে অকৃত্রিম বন্ধু আর কে বিশ্বাসঘাতক? থাকগে এখন যুদ্ধের আয়োজন কর। শুনেছি মলয় পর্বতে রাজা চিত্রবর্ণ এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

"হ্যাঁ মহারাজ, ঠিকই শুনেছেন।" মন্ত্রী বলল, তবে এখন তাদের নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধেছে। এই সময়ই তাকে জয় করতে হবে। কারণ—

কথিত আছে লোভী, নিষ্ঠুর, অবসাদগ্রস্ত, মিথ্যাবাদী, অসাবধানী, ভীরু, অব্যবস্থিতচিত্ত, মূর্খ এবং যুদ্ধে অপমানিত সৈনিককে অনায়াসে ধ্বংস করা যায়।

দীর্ঘপথ অতিক্রমে পরিশ্রান্ত, নদী, পর্বত, বন, ঘোর অগ্নি, ভয়ে ক্লিষ্ট, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত, মত্ত, ভোজনে উদ্‌গ্রীব, রোগ ও দুর্ভিক্ষে পীড়িত, অস্থির, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাতযুক্ত, কাদা ও ঘোলাজল সমন্বিত সিক্তিপৃচিত্র, দস্যুতস্করের ভয়ে ভীত, এরকম শত্রুসৈন্যকে রাজা বিনাশ করবেন।

তাই আমি আমাদের সৈন্যদের আদেশ দিয়েছি চিত্রবর্ণের সৈন্যদের আক্রমণ করবার জন্য এবং তারা বহু সৈন্য হত্যা করেছে।

এদিকে রাজা চিত্রবর্ণ পড়লেন মহা মুশকিলে। বহু সৈন্য ও সেনাপতির নিহত হওয়ার খবর পেয়ে রাজা তার মন্ত্রী শকুনিকে বললেন, মন্ত্রী, আপনি আমাকে অবজ্ঞা করছেন কেন? আমার কি কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে? কারণ আমি জানি—

ঔদ্ধত্য দ্বারা রাজ্য পাওয়া যায় না, অন্যায় আচরণ করা উচিত নয়। বার্ধক্য যেমন উত্তম সৌন্দর্য নষ্ট করে, ঔদ্ধত্যও সেইরূপ সম্পদ নষ্ট করে।

কর্মক্ষম ও কর্মকুশলী ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে, সুখাদ্যভোজী ব্যক্তি নীরোগ হয়, রোগহীন মানুষ আনন্দিত হয়, উত্তমশীল মানুষ হয় সর্বশাস্ত্রদর্শী এবং বিনয়ী মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কীর্তি লাভ করে।

শকুনি বলল, "মহারাজ, জলাশয় সন্নিহিত বৃক্ষ যেমন সুদৃশ্য হয়, রাজা অবিদ্বান হলেও জ্ঞানবৃদ্ধের উপদেশ দ্বারা উত্তম সম্পদ লাভ করে।

মদ্যপান, পরদারগমন, পশুহত্যা, অক্ষক্রীড়া, অন্যায়ভাবে অর্থগ্রহণ, বাক্যে কর্কশতা ও দণ্ডে নিষ্ঠুরতা এ সকল রাজার বিপদের কারণ।

মহারাজ, আপনি সৈন্যদের উৎসাহ ও সাহস দেখে আমাকে অবজ্ঞা করেছেন, তা এখন তার ফলভোগ আপনাকে করতেই হবে। কথিত আছে—

নীতিদোষ কোন্ কু-মন্ত্রীকে না আশ্রয় করে? অপথ্যভোজী কাকে না রোগ কষ্ট দেয়? সম্পদ কাকে না গর্বিত করে? যম কাকে না নিহত করে? স্ত্রীলোকের অন্যায় কার্য কাকে না ক্ষুব্ধ করে?

বিষাদ আনন্দকে, শীত শরৎকালকে, সূর্য অন্ধকারকে, কৃতঘ্নতা সুপ্রকৃতিকে, ইষ্টলাভ শোককে, নীতি বিপদকে, দুর্নীতি সমৃদ্ধিকে নাশ করে।

যার নিজের বুদ্ধি নেই শাস্ত্র তার কি করবে?

যার চোখ নেই দর্পণ তার কি করবে?

এসব চিন্তা করে আমি চুপচাপ আছি মহারাজ।"

রাজা বললেন, "না মন্ত্রী, আমার অপরাধ হয়েছে। যাহোক আমি

যেন অবশিষ্ট সৈন্যের সঙ্গে এখন বিন্ধ্যপর্বতে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।”

মন্ত্রী চুপ করে থেকে ভাবল—দেবতা, গুরু, ধেনু, রাজা, ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের প্রতি সর্বদা ক্রোধ সংযত করা উচিত। তারপর হেসে বলল, “মহারাজ—

শত্রুর ভেদবুদ্ধি পুনঃ সংযোজনে মন্ত্রীরও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদির বিকার উপস্থিত হলে চিকিৎসকের বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সহজসাধ্য বিষয়ে কোন্ মানুষ না পণ্ডিত ?

অল্পবুদ্ধির মানুষ অল্পায়াসসাধ্য কাজ আরম্ভ করে তা শেষ করবার জন্য অধীর হয়, আর বুদ্ধিমান মানুষ মহৎ কাজ আরম্ভ করে তা সম্পন্ন করার জন্য ধৈর্যশীল হয়।

আপনার পরাক্রমেই তাদের দুর্গ ধ্বংস করে আপনাকে সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্বতে নিয়ে যাব।”

“কি করে ? এত অল্প সৈন্য নিয়ে ?” রাজা বললেন।

“সবই হবে মহারাজ।” মন্ত্রী বলল, “ক্ষিপ্রকারিতাই জয়লাভের কারণ। আজই দুর্গদ্বার অবরোধ করুন।”

সেই বকদূত তখন এসে রাজা হিরণ্যগর্ভকে বলল, “মহারাজ, চিত্রবর্ণের মন্ত্রী শকুনির পরামর্শে রাজা এসে দুর্গদ্বার অবরোধ করছে।”

ঘাবড়ে গেল রাজহংস। বলল, “মন্ত্রী, তাহলে উপায় ?”

মন্ত্রী চক্রবাক বলল, “নিজ সৈন্যের বল পরীক্ষা করুন মহারাজ, তাদের অর্থ বস্ত্র উপহার দিন।”

“কি বলছ মন্ত্রী ?” রাজা বললেন।

“হ্যাঁ মহারাজ।”

চক্রবাক বলল “যজ্ঞে, বিবাহে, বিপদে, শত্রুবিনাশে, কীর্তিসাধনে, মিত্রসংগ্রহে, প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ও দরিদ্র বন্ধু বা আত্মীয়ের জন্য ব্যয়—এই আট প্রকার ব্যয় রাজার অতিরিক্ত নয়।

মন্দবুদ্ধির লোক অল্প ধনক্ষয়ের ভয়ে সর্বনাশও করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজশুল্কের ভয়ে পণ্যদ্রব্য পরিত্যাগ করে?"

রাজা বললেন, "কিন্তু এসময় কি অত ব্যয় করা উচিত হবে? বিপদের জন্য অর্থসঞ্চয় করা দরকার।"

"মহারাজ, বিপদই তো এখন। নিজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের দান ও সম্মান দ্বারা পুরস্কৃত করুন।

প্রভুর অনুগ্রহলাভে হৃষ্টচিত্ত, পরস্পর সহায়ক, নিজের প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, সংকুলজাত সম্মানিত সৈন্য শত্রুর শক্তি জেনে জয়লাভ করেন।"

যে আত্মপরভেদজ্ঞানে মঢ়, উ , কৃতঘ্ন, স্বার্থপর, সে বিদ্বান হলেও কি অন্যদ্বারা পরিত্যাজ্য নয়?

সত্যনিষ্ঠা, পুরুষকার ও সংপাত্রে দান—এই তিনটি গুণ রাজাদের উৎকর্ষসাধক ধর্ম। এই গুণ ছাড়া রাজা নিশ্চিত নিন্দাভাজন হন।

কাজেই মহারাজ মন্ত্রীদের পুরস্কার দিন। কারণ—

পুরস্কারহেতু যে মানুষ যার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সে তার উন্নতিতে উন্নত, বিপদে বিপন্ন হয়, সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ধন ও প্রাণরক্ষায় নিযুক্ত করা উচিত।

মহারাজ, শঠ, নারী ও বালক যার মন্ত্রণাদাতা হয়, সে কর্তব্যকর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দুষ্কর্মের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

যে রাজার হর্ষ ক্রোধ সংযত ও ধনাগার পরিমিত ব্যয়ে নিয়মিত, ভৃত্যদের প্রতি সুখ-দুঃখ বিধানে সর্বদা তৎপর, পৃথিবী তার কাছে রত্নপ্রসবিনী হন।

রাজার সঙ্গে যেসব অমাত্যের উন্নতি-অবনতি নিশ্চিত জড়িত, রাজনীতিকুশল সেই রাজা কখনও সেই সমসুখদুঃখ ত্যাগী অমাত্যকে অপমান করেন না।

ধনগর্বিত, বিবেকহীন রাজা নীতিবিহর্গিত কাজে নিমজ্জিত হলেও সুপণ্ডিত সদুপদেশ দিয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

এমন সময় মেঘবর্ণ নামে এক সেনাপতি এসে রাজাকে বলল, "প্রভু, বিপক্ষের সৈন্য এসে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। আমি আপনার আদেশ নিয়ে বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তাতে প্রভুর নিকট আমি ঋণমুক্ত হব। আমি যাই, প্রভু।"

চক্রবাক বলল, "যাও, যাও শিগগির যাও।"

কাক বলল, "প্রভু, আপনিও আসুন। যুদ্ধ দেখুন।"

তারপর তারা সকলে মিলে গিয়ে তুমুল যদ্ধ করল।

এদিকে তারপর দিন রাজা চিত্রবর্ণ তার মন্ত্রী শকুনিকে বলল, "এখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।"

শকুনি বলল, "মহারাজ, ভয় নেই—

দীর্ঘকাল সহ্য করতে অক্ষম, অদূর নীতিজ্ঞানবিহীন, পানাদি আসক্ত সেনাধ্যক্ষ অরক্ষিত ভীরু সৈন্য যাদের দুর্গবিপত্তি বলা হয়, তারা কেউ এখানে নেই। তবে আমাদের এখন দুর্গ-মধ্যস্থিত সৈন্যের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি অবরোধ, সহসা আক্রমণ, তীব্র পৌরুষের সঙ্গে সাহস প্রদর্শন করতে হবে। এই চারটিই হল দুর্গ অধিকার করবার উপায়।

চিত্রবর্ণ বলল, "বেশ তাই হোক।"

তারপর সেই রাত্রিতেই দুর্গের চারটি দ্বারেই লেগে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। এদিকে কাক করেছে কি, এই অবসরে দুর্গের প্রতিটি ঘরেই এক-একটা মশাল ফেলে দিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "দুর্গ অধিকৃত হয়ে গেছে, দুর্গ অধিকৃত হয়ে গেছে।"

এই চিৎকার শুনে রাজা হিরণ্যগর্ভের পাত্র-মিত্র-সভাসদ ও সৈন্যরা গেল ঘাবড়ে। আর ঘাবড়াবে নাই বা কেন? সব ঘরে আগুন জ্বললে আর সৈন্যদের চিৎকারে কেইবা ভয় না পায়? তাই তারা সকলে মিলে দুদ্দাড় করে গিয়ে পড়ল দুর্গের সামনের জলে। কিন্তু

সেনাপতি সারসকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি মুরগি এসে ধরল চেপে। হায়, হায়, করে উঠল রাজা হিরণ্যগর্ভ। বলল, "সেনাপতি সারস, যে ভাবেই হোক তুমি পালাও। আমি যেতে পারছি না, কিন্তু তুমি নিজেকে বাঁচাও। আমার ছেলে চূড়ামণিকে সবার অনুমতি নিয়ে রাজা করো।"

"না না, প্রভু!" চিৎকার করে উঠল সারস যুদ্ধ করতে করতে। "এমন কথা বলবেন না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ আমি তা হতে দেব না।

ক্ষমাশীল, দানশীল ও গুণগ্রাহী প্রভু পুণ্যবলেই লাভ করা যায়।"

রাজা বললেন, "কিন্তু বিশুদ্ধ স্বভাব, কর্মকুশল, অনুরক্ত ভৃত্যও তো দুর্লভ।"

সারস বলল, "মহারাজ, যুদ্ধ পরিত্যাগ করলে যদি মৃত্যুভয় না থাকে তাহলে সমরস্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে যাওয়াই উচিত। মৃত্যু যদি অবশ্যই ঘটে তবে বৃথা যশকে কলুষিত করছেন কেন?

প্রভু, আপনিও তো সর্বপ্রকারে রক্ষণীয়।

রাজা, মন্ত্রী, রাজ্য, দুর্গ, ধনাগার, সৈন্য, মিত্রভাবাপন্ন রাজা ও নগরবাসীগণ রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ।

অমাত্যরা সমৃদ্ধশালী হলেও রাজাকে পরিত্যাগ করে বাস করতে পারেন না—যেমন মৃত্যু যার সন্নিকট, ধন্বন্তরী হলেও তার কি করবেন?"

ঠিক এই সময়ে এক ফাঁকে সেই মুরগি এসে রাজাকে চেপে ধরে ঠোকরাতে লাগল। তা দেখে সারস ছুটে এসে তার নিজের পাখা দিয়ে রাজাকে আচ্ছাদিত করে রক্ষা করতে লাগল।

মুরগিও তো কম যায় না। সে তখন রাজাকে ছেড়ে ধরল সারসকে। সারসও কম যায় না। সেও তখন ঠোকরাতে লাগল

মুরগিকে। এতক্ষণ যুদ্ধ করে মুরগিটা হয়ে গিয়েছিল পরিশ্রান্ত। সে আর সারসের সঙ্গে পারল না। সারস ঠোকরাতে ঠোকরাতে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তা দেখে অন্যেরা ছুটে এসে সারসকে ঘিরে ধরে ঠোকরাতে ঠোকরাতে ধরাশায়ী করে ফেলল। জয় হল রাজা চিত্রবর্ণের।

তারপর রাজা চিত্রবর্ণ দুর্গে ঢুকে দুর্গের সব জিনিসপত্র তছনছ করে জয়ধ্বনি করে ফিরে গেল শিবিরে।

এই কথা বলে গুরুদেব যেই চুপ করলেন, রাজপুত্রেরা সবাই বলে উঠল, "তাহলে গুরুদেব সারসই তো পুণ্যবান। সে-ই তো নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রভুর জীবন রক্ষা করেছে।"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, তা ঠিক। কথায়ই তো আছে—

যে কোন দেশে বীরপুরুষ যদি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হয়ে প্রাণত্যাগ করে তবে সে অক্ষয় স্বর্গলাভ করে।

যাক, যুদ্ধ 'বিগ্রহ' কেমন লেগেছে বল?"

"অত্যন্ত সুন্দর গুরুদেব।" চেঁচিয়ে উঠল রাজপুত্রেরা।

"বেশ, বেশ। তাহলে পরের দিন বলব সন্ধি।" বলে গুরুদেব উঠে গেলেন।

সন্ধি

তার পরদিন বিষ্ণুশর্মা এসে রাজপুত্রদের বিগ্রহ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "এখন আমি তোমাদের সন্ধি সম্বন্ধে বলব। মন দিয়ে শোন।"

রাজপুত্রেরা বলল, "বলুন গুরুদেব।"

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "তারপর হিরণ্যগর্ভ ও চিত্রবর্ণের তুমুল যুদ্ধ বন্ধ হলে তাদের দুইজনের মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা করে সন্ধি স্থাপিত হল।"

"কি রকম? কি রকম গুরুদেব?" রাজপুত্রেরা বলল।

"শোন।" গুরুদেব বলতে লাগলেন, "দুর্গের সব ঘরে আগুন লেগেছিল, মনে আছে তো?"

"হ্যাঁ গুরুদেব।" রাজপুত্রেরা বলল।

"সেই কথা বলেই রাজহংস তার মন্ত্রীকে বলতে লাগল।" গুরুদেব বললেন, "আমাদের দুর্গে কে আগুন লাগিয়ে গেল বল তো চক্রবাক? এ কি কেবল শত্রু না আমাদের দুর্গেই থাকত এমন কেউ?"

চক্রবাক বলল, "মহারাজ আমাদের বন্ধু মেঘবর্ণকে তো সপরিবারে এখানে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় তারই কাজ।"

রাজা একটু ভেবে বলল, "হ্যাঁ, হতে পারে। কি জান চক্রবাক, এ আমারই দুর্ভাগ্য। কারণ—

অপরাধ সেই দৈবের, মন্ত্রীদের নয়।

যত্ন করে কাজ করলেও দৈবদুর্বিপাকবশত বিনাশ হয়।

"আজ্ঞে—" চক্রবাক বলল, "এ তো আমি আগেই বলেছি। মহারাজ—

নির্বোধ মানুষ বিপরীত কাজ হলেই দৈবকে নিন্দা করে ; কিন্তু নিজের কাজের দোষ স্বীকার করে না। যে মানুষ হিতৈষী বন্ধুর কথার সমাদর করে না সে কচ্ছপের মত কাঠ পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

রাজা বলল, "কি রকম ?"

"তাহলে শুনুন।" চক্রবাক বলতে লাগল :
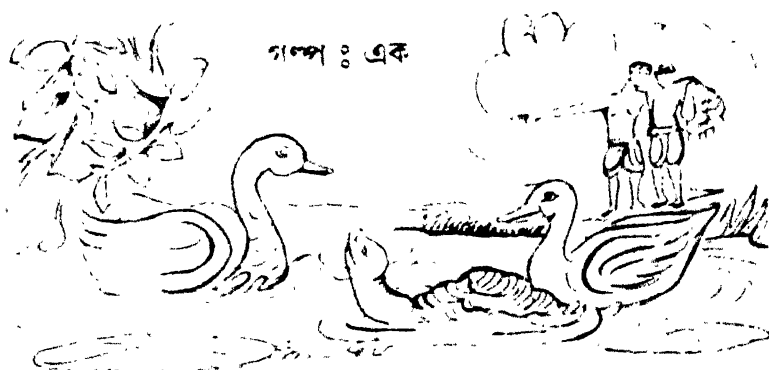
মগধ দেশে ফুল্লোৎপল নামে একটা সরোবর আছে। সেখানে সঙ্কট ও বিকট নামে দুইটি হাঁস ও তাদের বন্ধু কম্বুগ্রীব নামে একটা কচ্ছপ বাস করত।

একদিন কতগুলি জেলে এসে বলাবলি করতে লাগল, "এই দেখেছিস, এই সরোবরে মেলা মাছ ও কচ্ছপ আছে। চল এক কাজ করি, কাল সকালে এসে এই সরোবরে জাল ফেলি।" তারপর তারা সবাই মিলে সব ঠিক করে চলে গেল।

জেলেদের কথা তারা সবাই শুনেছিল। কিন্তু হাঁসগুলি বড় একটা গা করল না। কচ্ছপ বলল, "এই শুনেছ জেলেদের কথা ? এখন কি করবে ? তোমাদের তো কোন বিপদ নেই, কিন্তু আমার ?"

হাঁস বলল, "আরে এতো ভাবছ কেন ? তারা এসে আবার কি

বলে শোন। তারপর না হয় যা করা উচিত, তা করা যাবে। আগেই এত ভাবছ কেন ?"

কচ্ছপ বলল, "না না, তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি এর আগেও দেখেছি এখানে অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি নামে দুইটি মাছ থাকত। আর যদ্‌ভবিষ্য নামে আর একটি মাছ মারা গিয়েছিল।"

হাঁসদুটি বলল, "কি রকম ?"

"তাহলে শোন।" কচ্ছপ বলতে লাগল :

গল্প : দুই

বহুদিন আগে এই সরোবরেই আজকের মত একদিন একদল জেলে এসে মাছ ধরার কথা বলাবলি করছিল। সে কথা শুনে অনাগত বিধাতা নামে মাছটা বলল, "এই, তোমরা কি ঠিক করলে? আমি কিন্তু আজই অন্য সরোবরে চলে যাব।" বলে সে আর দেরি করল না। একটু পরেই গোপনে পাড়ে উঠে লাফাতে লাফাতে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কাছেই একটা জলাশয়ে চলে গেল।

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, "যাঃ, চলে গেল! যাকগে, যাক। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেই ভয়েই এখন মরি কেন? যখন যা হবে তখন নয়ত দেখা যাবে। কারণ কথায়ই তো আছে—

বিপদ উপস্থিত হলে যে প্রতিকার করে সে বুদ্ধিমান যেমন বণিকের সামনে বণিকপত্নী তার বিশ্বস্তকে গোপন করেছিল।

যদ্‌ভবিষ্য বলল, "কি রকম?"

"তা হলে শোন।" প্রত্যুৎপন্নমতি বলতে লাগল:

বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল রত্নপ্রভা। সুখে শান্তিতেই তারা বাস করে। সমুদ্রদত্ত দিনরাত তার ব্যবসা নিয়েই মেতে থাকে। আর তার স্ত্রীর কাটে পুজো অর্চনা করে। কিন্তু সমুদ্রদত্ত পুজো অর্চনার ধারেকাছেও যায় না।

একদিন সমুদ্রদত্ত বাড়ি নেই। রত্নপ্রভা তার চাকরকে ডেকে পুজোর কিছু জিনিস কিনে আনবার জন্য টাকা দিচ্ছিল, এমন সময় তার স্বামী পেছন থেকে এসে ফেলল দেখে। রত্নপ্রভা ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরের হাত থেকে টাকাগুলি তুলে নিয়ে ঘুরে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "দেখলে, দেখলে কি কাণ্ড। আমি না দেখলে তো হয়ে গিয়েছিল। এই লোকটা এতগুলি টাকা কোত্থেকে পেল কে জানে? আমি বলতেই তো আমতা আমতা করতে লাগল?"

"কি? এত বড় আস্পর্দা?" বণিক বলে উঠল, "আমার ঘরে চুরি?"

"না না, তুমি কিছু বল না।" রত্নপ্রভা বলল. "আমি পরে দেখব। বলে কোনমতে সে তার স্বামীকে শান্ত করে পাঠিয়ে দিল বিশ্রাম করতে।

এদিকে গিন্নীমার রকমসকম দেখে চাকর তো গেল ভীষণ রেগে। কি? আমাকে চোর অপবাদ?

হা হা করে উঠল রত্নপ্রভা। "আরে, দাঁড়া দাঁড়া–।" আর তারপর নানা তোয়াজে তাকে শান্ত করে পাঠিয়ে দিল গিন্নী।

"এজন্যই—।" প্রত্যুৎপন্নমতি বলতে লাগল, "আমি বলছিলাম বণিকপত্নী বিশ্বস্তকে গোপন করেছিল।"

যদ্‌ভবিষ্য বলল, "কিন্তু ভাই,—যা হবার তা হবে, যা হবার নয় তা কখনও অন্যথা হবে না এই চিন্তারূপ বিষনাশক ঔষধ মানুষ যে কেন পান করে না?"

তার পরদিন জেলেদের জালে প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্‌ভবিষ্য দুজনেই পড়ল ধরা। প্রত্যুৎপন্নমতি তো ধরা পড়ে নিশ্চল হয়ে রইল শুয়ে। জেলেরা তাই ওটার দিকে নজর না দিয়ে জাল থেকে ছাড়িয়ে রেখে দিল এক পাশে। প্রত্যুৎপন্নমতিও সুযোগ বুঝে এক লাফে জলে। কিন্তু যদ্‌ভবিষ্য যেতে পারল না। জেলেরা তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

তাই আমি বলছিলাম— কচ্ছপ বলতে লাগল, "অনাগত বিধাতার কথা। কাজেই যাতে অন্য জলাশয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা কর।"

হাঁস বলল, "তা ঠিক। কিন্তু যাবে কি করে?"

"কেন?" কচ্ছপ বলল, "উড়ে!"

ধর একটা কাঠি তোমরা দুজনে ঠোঁটে ধরে উড়ে নিয়ে চললে, আর আমি তার মাঝখানটা কামড়ে ধরে রইলাম। তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে আমি উড়েই যেতে পারি।"

হাঁসেরা বলল, "হ্যাঁ, তা পার। কিন্তু—

বুদ্ধিমান মানুষ উপায় ও বিপদের কথাও চিন্তা করেন: মূর্খ বকেরা প্রত্যক্ষ করলেও নকুল তাদের বাচ্চাগুলি খেয়ে ফেলেছিল।

কচ্ছপ জিজ্ঞাসা করল, "কি রকম?"

"তাহলে শোন।" হাঁস বলতে লাগল:

উত্তরাপথে গৃধ্রকূট নামে এক পর্বত আছে। সেখানে রেবা নদীর তীরে একটা বিরাট বটগাছে বহু বক বাস করত। গাছের নিচে ছিল একটা গর্ত। তাতে একটা সাপ বাস করত। সেই সাপটা করত কি, সে মাঝে মাঝেই গাছে উঠে বকের বাচ্চা খেয়ে ফেলত। বকেরা পড়ল মুশকিলে।

এর মধ্যে একদিন এক বৃদ্ধ বক বলল, "তোমরা এক কাজ কর, একটু দূরে যে ঐ নকুলের গর্তগুলি আছে সেখান থেকে এই সাপের গর্ত পর্যন্ত তোমরা কিছু মাছ এনে রেখে দাও। তারপর দেখ কি হয়। দেখবে নকুলগুলি মাছ খেতে খেতে ঠিক এসে হাজির হবে সাপের গর্তে। আর তারপর সাপ তো তাদের শত্রুই।"

তার পরদিন ঠিক তাই হল। নকুলগুলি মাছ খেতে খেতে ঠিক দেখল সাপকে। আর তারপর সাপকে শেষ করতে তাদের কতক্ষণ লাগে?

সাপের তো দফারফা। কিন্তু এদিকে হল আরেক বিপত্তি। নকুলগুলি সাপকে শেষ করে গাছে উঠে বকদের বাচ্চা খেতে লাগল।

এর জন্য তো বকেরা প্রস্তুত ছিল না। হায় হায় করে উঠল সবাই। কিন্তু এখন দুঃখ করে কি হবে? পথ তো দেখিয়েছে তারাই। তাই বলছিলাম, হাঁস বলতে লাগল, উপায় ও বিপদের চিন্তার কথা।

যাকগে, আমরা তোমাকে এভাবে নিয়ে গেলে নিচ থেকে কিন্তু মানুষেরা নানা কথা বলবে। তখন যদি তুমি কিছু উত্তর দাও—।"

"না, না, উত্তর দেব কেন?" কচ্ছপ বলল, "মুখ খুললে যে পড়ে যাব সে কি আর জানি না?"

"ঠিক আছে।" হাঁসেরা বলল, "তাহলে চল।" বলে তারা কচ্ছপকে নিয়ে উড়ে চলল। আর কচ্ছপ কাঠিটার মাঝখানে কামড়ে ধরে ঝুলে রইল।

বেশিক্ষণ উড়ে যায়নি তারা, এমন আশ্চর্য কাণ্ড তো আর দেখেনি কেউ, কতগুলি রাখাল ছুটল পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে।

"এই দেখেছিস একটা কচ্ছপ কেমন একটা কাঠি কামড়ে উড়ে যাচ্ছে। ইস্, যদি এটা পড়ে তবে বাড়ি নিয়ে যাব।"

কেউ বলল, "যা যা, এটা পড়লে এখানেই রেঁধে খেয়ে ফেলব।"

এসব কথা শুনে কচ্ছপের গেল রাগ হয়ে। সে তারপর সব ভুলে চিৎকার করে উঠল, "তোরা ছাই খাবি।" আর যাঁহাতক কথা বলল কচ্ছপ ঝপ করে সে গেল পড়ে। রাখালেরা তারপর মজা করে তাকে নিয়ে চলে গেল।

"তাই বলছিলাম মহারাজ—" মন্ত্রী বলতে লাগল, "হিতৈষী বন্ধুর কথার সমাদরের কথা।"

একটু পরেই দূত বক এসে বলল, "মহারাজ, আমি আগেই বলে-ছিলাম সব সময়ে দুর্গ সুরক্ষিত রাখতে হবে। কিন্তু আপনারা তা অবজ্ঞা করেছেন। তার ফলই এই। সেই কাকই দুর্গ পুড়িয়েছে।"

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

"সৌহার্দ্য বা উপকারের জন্য যে শত্রুকে বিশ্বাস করে সে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই গাছের উপর থেকে পড়ে জেগে ওঠে।"

তারপর দূত আবার বলতে লাগল, "এখানে দুর্গ পুড়িয়ে কাজ শেষ করে রাজা চিত্রবর্ণকে সব বলল। রাজা খুব খুশি। তারপর তাকে দিল পুরস্কার। আর পুরস্কারটাও কি জানেন মহারাজ? কর্পূরদ্বীপের রাজ্যে তাকে অভিষিক্ত করা হল।"

কারণ—

কৃতকার্য ভৃত্যের কাজকে অস্বীকার করা উচিত নয়। পুরস্কার, সন্তোষভাব প্রকাশ, মধুর বাক্য ও প্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত।

কিন্তু মহারাজ প্রধান মন্ত্রী শকুনি বাধা দিলেন। বললেন, "না মহারাজ, এ পুরস্কার দেবেন না, তাকে অন্য পুরস্কার দিন। কারণ—

ক্ষুদ্রজন উচ্চাধিকার পেলে প্রভুকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে। মূষিক যেমন বাঘ হয়ে মুনিকে হত্যা করতে গিয়েছিল।"

রাজা জিজ্ঞেস করল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন মহারাজ।" শকুনি বলতে লাগল:

গৌতমারণ্যে মহাতপা নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি একদিন স্নান করে আসছেন হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা কাকের মুখ থেকে একটা ইঁদুরের বাচ্চা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। তাকে দেখে মুনির খুব দয়া হল। তিনি তক্ষুনি বাচ্চাটাকে যত্ন করে তুলি নিয়ে আশ্রমে রেখে দিলেন।

দিন যায়। ইঁদুর ছানাটা বড় হয়েছে। এখন সে চারিদিকে খেলা করে বেড়ায়। একদিন হঠাৎ এক বিড়াল তাকে তাড়া করল। সে কোনমতে ছুটে মুনির কাছে এসে প্রাণ বাঁচায়। মুনি দেখে ভাবলেন, আহা রে! বেচারার বড় কষ্ট। কখন না বিড়াল তাকে খেয়ে ফেলে। তারপর তার দুঃখে তিনি তাকে মন্ত্র পড়ে একটা বিড়াল বানিয়ে দিলেন।

বিড়াল হয়ে তার এখন খুব মজা।

হঠাৎ আবার একদিন এক কুকুর করল বিড়ালকে তাড়া। সে তো পড়িমড়ি করে ছুটে এসে মুনির পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনি দেখলেন, সত্যিই তো, কুকুর যদি বিড়ালকে খেয়ে ফেলে? তাই

তাই তিনি সেদিন তাকে একটা কুকুর বানিয়ে বললেন, "যা বেটা, এখন আর ভয় নেই তোর। খেলা করগে।"

কিন্তু হলে কি হবে? একদিন বাঘ করল কুকুরকে তাড়া। মুনি পড়লেন মুশকিলে। তাই তিনি কুকুরকে একটা বাঘ বানিয়ে ভাবলেন, আর কোন ঝঞ্ঝাট হবে না। কিন্তু তা কি হয়?

বাঘ তো এখন মনের আনন্দে আছে। মুনি যে একটা ইঁদুরকে বাঘ করে দিয়েছেন। একথা বনে যে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটতে আসত তারা সবাই জানত। বলাবলি করত। রোজ একথা শুনে বাঘ ভাবল, নাঃ! যতদিন মুনি জীবিত আছেন ততদিন আমার এই নিন্দা তো যাবার নয়। তাই সে করল কি, একদিন মুনি তপস্যায় বসে আছেন, তাকে খেয়ে ফেলবার জন্য সে গুটিগুটি এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শত হলেও মুনি তো অন্যের মনের কথা জানতে পারেন, সব বুঝে ফেললেন তিনি। আর তক্ষুনি বাঘটা কেবল লাফ দিচ্ছিল তিনি বলে উঠলেন, "যা বেটা তুই আবার ইঁদুর হয়ে যা।" ব্যস, হয়ে গেল ইঁদুরের বাঘ হওয়া। যা ছিল তাই হয়ে গেল আবার। তাই বলছিলাম মহারাজ, ক্ষুদ্রজন উচ্চাধিকার পেলে কি হয়। আর তাছাড়া তার পক্ষেও যে এটা খুব সহজসাধ্য হবে তাও নয়। এই ধরুন না—

মূর্খ বক ছোট বড় বহু মাছ খেয়ে অতি লোভে কাঁকড়া খেতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।"

চিত্রবর্ণ বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন।" মন্ত্রী বলতে লাগল—

গল্প : ছয়

মালব দেশে পদ্মগর্ভ নামে একটা সরোবর আছে। সেখানে একদিন একটা বৃদ্ধ বক চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল। দূর থেকে একটা কাঁকড়া তাকে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আজ্ঞে আপনি এখানে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কি ভাবছেন?"

বক বলল, "আর বল কেন? মাছই তো আমার খাবার। কিন্তু নগরে শুনে এসেছি জেলেরা নাকি কিছুদিনের মধ্যেই সব মাছ ধরে নিয়ে যাবে। তাই ভাবছি, মাছই যদি ধরে নিয়ে যায় তবে আমি খাব কি? তাই আমার আর কিছুই ভাল লাগছে না।"

আশেপাশে কিছু মাছও গোপনে গোপনে বককে লক্ষ্য করেছিল। এখন বকের কথা শুনে তাদের ভয় লেগে গেল। তারা তখন সবাই মিলে ভাবল এমন কথা যখন বক নিজের মুখেই বলছে তখন সে আমাদের উপকারী না হয়েই যায় না। তাহলে এখন কি করা কর্তব্য তাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

"অতি উত্তম হয়" সবাই বলে উঠল। "কারণ, কথায়ই তো আছে।

উপকারী শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করা উচিত অপকারী মিত্রের সঙ্গে নয়। উপকারী কি অপকারী এ দুটি লক্ষণই দ্রষ্টব্য।

তখন সব মাছই এসে বককে বলল, "আচ্ছা, এখন আমরা কি করব ?"

বক বলল, "অন্য কোন জলাশয়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না। তোমরা যদি বল তবে আমি তোমাদের এক এক করে নিয়ে যেতে পারি।"

সবাই বলে উঠল, "সেই করুন আপনি।"

তারপর বকের তো মজা। সে এক এক করে মাছ নিয়ে যায়, আর এক জায়গায় বসে খায়। কিছুদিনের মধ্যেই সে সরোবরের সব মাছ খেয়ে ফেলল।

এদিকে এক কাঁকড়ার মনে লাগল ভয়। তাই সে একদিন বককে বলল, "আচ্ছা, আপনি তো সব মাছকেই নিয়ে গেছেন অন্য জলাশয়ে, আমাকে নেবেন ?"

বক শুনে তো ভারী খুশি। বলল, "কেন নেব না ? যেতে চাও তো চল।" বলে সে ভাবল, বাঃ রে বাঃ ! কাঁকড়া তো খাইনি কোনদিন, আজ খেয়ে দেখব কি রকম লাগে।

এদিকে কাঁকড়া তো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তা হলে নিন না আমাকে।" বলে সে বকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বকও তক্ষুনি এক ঝটকায় তাকে তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল সেই জায়গায়, যেখানে সে রোজ বসে বসে মাছ খায়। জায়গাটা দেখেই তো কাঁকড়ার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কি সর্বনাশ ! এত মাছের কাঁটা ! তার মানে বক মাছগুলি এনে এনে এখানে বসে খেয়েছে ! অন্য জলাশয়ে নিয়ে যায় নি ! আমাকেও এনেছে এখানে খাবে বলে ! ভয় পেলেও সে মনে মনে ঠিক করল, না ভয় পেলে তো চলবে না। যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কারণ কথায়ই তো বলে—

যতক্ষণ ভয়ের কারণ না আসে ততক্ষণই ভয় করা উচিত।
কিন্তু ভয়ের কারণ এলে নির্ভীকের মতই আচরণ করতে হয়।

আক্রান্ত ব্যক্তি যখন নিজের একটুও কল্যাণ দেখেন না তখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই প্রাণ বিসর্জন দেন। (অর্থাৎ কাপুরুষের মত জয় অপেক্ষা বীরের মতই জয় ভাল)।

কাজেই সে চট করে দাঁড়া দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল।

বক তো আর এর জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে কোনমতেই কাঁকড়াকে গলা থেকে ছাড়াতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না।

"তাই বলছিলাম মহারাজ—" মন্ত্রী বলতে লাগল, অতি লোভে মাছ খেতে গিয়েই না বকের এই দশা হয়েছিল।"

রাজা বলল, "হুম। আমি বলছিলাম কি মন্ত্রী, মেঘবর্ণ কর্পূর দ্বীপে যা ভাল ভাল জিনিস আছে সবই আমাদের উপকার দেবে। তাহলে—"

কথা শেষ করতে পারেনি রাজা মন্ত্রী বলে উঠল, মহারাজ —

যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে আনন্দিত হবে সে মাটির পাত্র ভেঙে ব্রাহ্মণের মত তিরস্কার প্রাপ্ত হয়।

রাজা বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন।" মন্ত্রী বলতে লাগল—
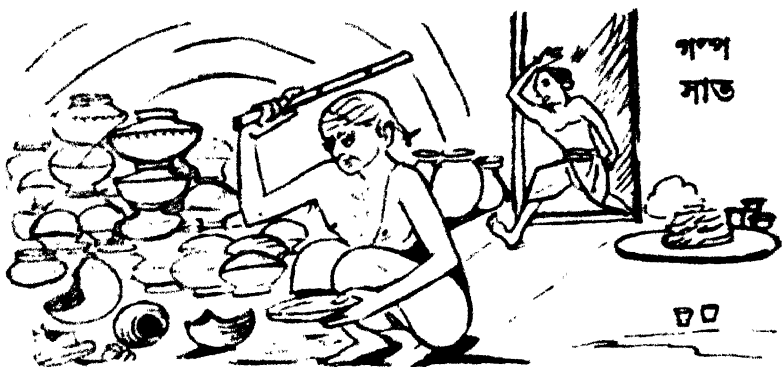
দেবীকোট নামক এক নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। যজমানদের পুজোআচ্চা করেই তার জীবিকা নির্বাহ হত।

একদিন তিনি ভিন্ন এক গ্রাম থেকে এক সংক্রান্তি তিথিতে এক সরা ছাতু পেয়ে খুশি মনে ফিরে আসছিলেন বাড়ি। প্রচণ্ড রোদ্দুর। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সবে এক কুমোরের বাড়ি দেখে সেখানে আশ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণ দেখে কুমোরও খুব খাতির যত্ন করে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর একটা পাটি পেতে বিশ্রাম করতে দিল।

কুমোরের বাড়ি তো। সেই ঘরে সারি সারি হাঁড়ি কলসী স্তূপ করে সাজান ছিল। ব্রাহ্মণ করল কি, তার লাঠি গাছ খানা পাটির পাশে রেখে ভাল করে বসে ছাতুর সরাখানা রেখে দিল শিয়রের পাশে।

এত ছাতু খেয়ে ব্রাহ্মণের মনটা ছিল খুব খুশি। ঘুম কি আর আসে? ব্রাহ্মণ বসে বসেই ছাতুর সরাটার দিকে চেয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল।

ভাবতে লাগল এই ছাতুর সরাটা বিক্রি করে যদি দশটি পয়সা পাই, তবে এ দিয়ে আমি কুমোরের মত আরও অনেক ঘট, সরা ইত্যাদি কিনে আবার বিক্রি করব। তাতে আরও পয়সা পাব।

সেই পয়সা দিয়ে আমার আরও জিনিস কিনব। তাতে আরও পয়সা হবে। এভাবে সুপারি, কাপড় ইত্যাদির ব্যবসা করব। তখন বহু পয়সা হবে। এভাবে যখন লক্ষ টাকা হবে তখন আমি চারটি বিয়ে করব। মেয়েদের মন। একসাথে থেকে ঝগড়াঝাটি করবেই। আর আমি তখন তাদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করব। বলে সে তার লাঠিটা দিয়ে ধপাস ধাই করে এলোপাথারি হাঁড়ি কলসীতে পেটাতে লাগল। ফলে সব ভেঙে একাকার। তবুও তার হুঁস নেই।

কুমোর এসব ভাঙার শব্দ পেয়ে এ ঘরে এসে তো দেখে হায় হায় করে উঠল। আর তার পরে ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়ে বার করে দিল।

তাই মহারাজ ভবিষ্যতের চিন্তার কথা বলেছিলাম। বলে মন্ত্রী চুপ করল।

রাজা বলে উঠল, "তা ঠিক, কিন্তু কি করব বলে দিন।"

মন্ত্রী বলল, "মহারাজ বলুন তো, আমারা কি সৈন্যদের পরাক্রমে যুদ্ধ জিতেছি, না আমাদের নীতির জন্য?"

রাজা বলল, "আপনাদের নীতির জন্যই।"

"তাহলে মহারাজ।" মন্ত্রী বলতে লাগল, "আমি বলছি, আপনি স্বদেশে চলে যান। না হলে, বর্ষাকাল এলে আমাদের শত্রুপক্ষ কিন্তু তখন খুবই শক্তিশালী হবে। জলেই তো তাদের বাস। শত্রুপক্ষের দুর্গ ধ্বংস করেছেন, যশোলাভ করেছেন, আর কি চাই? তাছাড়া মহারাজ—

সমান বলের সঙ্গেই সন্ধি করা উচিত, কারণ যুদ্ধে বিজয়লাভ সন্দেহের বিষয়। বৃহস্পতি বলেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। কখন কখন উভয়েই যুদ্ধে নিহত হয়। সমান বলশালী হয়েও কি সুন্দ উপসুন্দ যুদ্ধে নিহত হয় নি?"

রাজা বলল, "কি রকম?"

"তা হলে শুনুন—।" মন্ত্রী বলতে লাগল—

গল্প ঃ আট

পুরাকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ছিল। তারা দুই সহোদর ভাই। একবার তারা ত্রিভুবনের রাজা হবার জন্য বহুদিন পর্যন্ত ভগবান মহাদেবের আরাধনা করেছিল। তাতে ভগবান মহাদেব তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "বর গ্রহণ কর।" এই কথা শুনে তারা খুব খুশি হয়ে ভগবানের পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, "আপনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আপনি আপনার পার্বতীকে আমাদের দান করুন।" তাতে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বুঝলেন তারা আরাধনা করলে হবে কি? তাদের দৈত্যের স্বভাব যাবে কোথায়?

যা হোক তিনি নিজেকে সংবরণ করে তাদের পার্বতীকে দান করলেন।

পার্বতী ছিলেন অসামান্যা রূপসী। তারা তখন কে পার্বতীকে নেবে বলে ঝগড়া আরম্ভ করল। তারা ঝগড়া করছে এমন সময় প্রভু মহেশ্বর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে তাদের কাছে এসে বললেন, "এই, তোমরা ঝগড়া কর কেন?"

তারা বলল, "এই তো, দেখুন না পার্বতীকে কে নেবে এটাই ঠিক করতে পারছি না।"

ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, "এই কথা? তোমরা ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করাই তো তোমাদের ধর্ম। তোমরা দুজনে যুদ্ধ করে ঠিক করে নাও না কেন?"

তারা বলল, "ঠিক বলেছেন, আমরা যুদ্ধ করব।" বলে তারা দুই জনে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল। যুদ্ধ করতে করতেই তারা নিহত হল।

তাই বলছিলাম মহারাজ, সমানের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত।"

রাজা বলল, "মন্ত্রী আগে কেন আমাকে এ উপদেশ দাওনি?"

"আপনি কি আমার কথা শুনেছিলেন?" মন্ত্রী বলল, "আমার সম্মতি নিয়ে কি যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল? হিরণ্যগর্ভ সন্ধি স্থাপনযোগ্য, যুদ্ধ নয়। কারণ—

সত্যপরায়ণ, মহাকুলসম্ভূত, ধর্মপরায়ণ, হীনকুলসম্ভূত, ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মিলিত, প্রভূত বলশালী, বহু যুদ্ধে বিজয়ী এই সাতজনের সঙ্গেই সন্ধি করতেন?"

এদিকে হয়েছে কি, রাজা হিরণ্যগর্ভও চক্রবাককে প্রশ্ন করেছে, "মন্ত্রী কাদের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত নয়?"

মন্ত্রী বলল, "কেন মহারাজ শুনুন—

(১) শিশু (২) বৃদ্ধ (৩) চিররুগ্ন (৪) জ্ঞাতি বহিষ্কৃত (৫) ভীরু (৬) ভীরুজন পরিবেষ্টিত (৭) লোভী (৮) লোভী কর্মচারী (৯) বিরক্ত প্রকৃতি (১০) বিষয়ে আসক্ত (১১) গুপ্ত কথা যে গুপ্ত রাখে না (১২) দেব ব্রাহ্মণ নিন্দাকারী (১৩) দৈববিড়ম্বিত (১৪) দৈবের উপর নির্ভরশীল (১৪) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত (১৬) সৈন্যের দ্বারা উপক্রান্ত (১৭) ভিন্ন দেশবাসী (১৮) বহু শত্রু যুক্ত (১৯) যুদ্ধের কথায় যে নিরূপণ করতে পারে না (২০) সত্য ধর্ম হতে বিচ্যুত।

এই কুড়ি রকম মানুষের সঙ্গে সন্ধি করবেন না।

তাছাড়া—

(১) সন্ধি (২) যুদ্ধ (৩) যুদ্ধযাত্রা (৪) যুদ্ধ স্থগিত রেখে অবস্থান (৫) প্রবল শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ (৬) বিদ্বেষভাব এই ছয়টি হল গুণ।

(১) যুদ্ধের সহায় সংগ্রহ (২) সৈন্য ও ধন সংগ্রহ (৩) স্থান কাল নির্ণয় (৪) বিপদ প্রতিকার (৫) কার্যসিদ্ধি এই পাঁচটি হল নীতি।

(১) সাম (২) দান (৩) ভেদ (৪) দণ্ড।

এই চারটি হল উপায় এবং

(১) উৎসাহ শক্তি (২) মন্ত্রশক্তি (৩) প্রভু শক্তি।

এই তিনটি হল শক্তি।

যা হোক মহারাজ, আমার মনে হয় মহামন্ত্রী শকুনিও কিন্তু আমাদের মত সন্ধি করা যায় কিনা খোঁজ করছেন। এক কাজ করুন, সিংহল দ্বীপে যে মহাবল সারস নামে রাজা আমাদের মিত্র, রাজত্ব করেন তার কাছে দূত পাঠান। তিনি যেন এই ফাঁকে জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেন। তাতে রাজা চিত্রবর্ণ আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবেন।"

"তাহলে তাই হোক।" বলে রাজা হিরণ্যগর্ভ তক্ষণি বিচিত্র নামে এক বককে দূত হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন সিংহলে "

তার পরদিনই দূত ফিরে এসে রাজাকে জানাল, "মহারাজ, মন্ত্রী শকুনি ইতোমধ্যেই খবর পাঠিয়েছে যে মেঘবর্ণ কাক আমাদের এখানেই থাকত, তাকে আমরাই প্রতারণা করে তাড়িয়েছি।"

এদিকে চিত্রবর্ণের রাজসভায় কিন্তু আরেক চিত্র। রাজা মেঘবর্ণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "মেঘবর্ণ, আচ্ছা, রাজা হিরণ্যগর্ভকে তোমার কেমন মনে হয়? মন্ত্রী চক্রবাকই বা কিরূপ?"

মেঘবর্ণ বলল, "মহারাজ, রাজা হিরণ্যগর্ভ রাজা যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী। আর চক্রবাকের মত মন্ত্রীও সচরাচর দেখা যায় না।

"তাই যদি হবে—" রাজা বলল, "তবে তোমাকে প্রতারিত করল কেন ?"

"প্রতারিত করবে কেন মহারাজ।" মেঘবর্ণ বলল, তিনি উদার হৃদয়। তা তা আর আগে বুঝতে পারিনি। মহারাজ—

যে মিথ্যাবাদীকে আপনার মত সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে সে যে ব্রাহ্মণ ছাগল থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তার মত বঞ্চিত হয়।

"কি রকম ?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"তাহলে শুনুন।" মেঘবর্ণ বলতে লাগল

গল্প : নয়

গৌতমারণ্যে একবার এক ব্রাহ্মণ একটা যজ্ঞ করবার আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞে লাগবে বলে তিনি ভিন্ন গ্রাম থেকে একটা পাঠা কিনে আসছিলেন ফিরে।

যেতে যেতে আরও খানিক গিয়ে তিনি পড়লেন তিন ধূর্তের খপ্পরে।

অনেক দূর থেকেই ব্রাহ্মণের কাঁধে পাঁঠাটাকে দেখে তারা ভাবল, যদি চালাকি করে ব্রাহ্মণের পাঁঠাটাকে পাওয়া যায় তবে খুবই ভাল হয়! তাই তারা তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের আগে আগে গিয়ে আলপথের তিন জায়গায় দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে ব্রাহ্মণ সড়ক ছেড়ে আলপথে নেমেছেন, খানিকদূর গিয়েই দেখা হল প্রথম ধূর্তের সঙ্গে। ধূর্ত বলল, "একি ঠাকুর মশাই আপনি একটা কুকুর কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"কুকুর!" ব্রাহ্মণ তো হতবাক। বললেন, "কই, এ তো একটা পাঠা!" বলে তিনি আবার চললেন তাড়াতাড়ি।

খানিক দূরে গাছের নিচে গিয়ে তার দেখা হল দ্বিতীয় ধূর্তের সঙ্গে। ধূর্ত বলল, "একি ঠাকুর, একটা কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন?"

ব্রাহ্মণের কেমন সন্দেহ হল, তবে কি তিনি সত্যিই একটা কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন? কই, কোথায় কুকুর? এ তো একটা পাঁঠা। বত্তসব। বলে তিনি রাগ করেই চলে এলেন সেখান থেকে। কিন্তু সন্দেহটা তার রয়েই গেল।

আরও খানিকদূর গিয়ে তার দেখা হল তৃতীয় ধূর্তের সঙ্গে। সেও যখন সেই একই কথা বলল তখন ব্রাহ্মণ ভাবলেন সত্যিই কি তাই! দেখি তো! বলে পাঁঠাটাকে মাটিতে নামিয়ে দেখে তার মনে হল তবে কি আমি ভুল দেখছি? এট একটা কুকুরই? না হলে তিনজন লোক একই কথা বলবে কেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি করেছি! বলে তিনি আর কোনদিকে না তাকিয়ে পাঁঠাটাকে রেখে চলে গেলেন হন হন করে।

ধূর্তটাও তারপর হাসতে হাসতে পাঁঠাটাকে নিয়ে চলে গেল বন্ধুদের কাছে।

তাই বলছিলাম মহারাজ—"মেঘবর্ণ বলতে লাগল—

দুর্জনের মধুর বাক্যে সাধুর বুদ্ধিও নিশ্চয়ই বিচলিত হয়।
যে দুর্জনের বাক্যে বিশ্বাস করে সে চিত্রবর্ণের মত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

রাজা বলল, "কি রকম?"

"তাহলে শুনুন।" মেঘবর্ণ বলতে লাগল—

কোন এক বনে ঘটোৎকট নামে এক সিংহ বাস করত। তার ছিল তিন অনুচর—বাঘ, শেয়াল ও এক কাক। তারা তিনজনে একসাথেই থাকে। একদিন তাদের সাথে এক উটের দেখা হল। উটও এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা সেই উটকে নিয়ে সিংহের কাছে গিয়ে বলল," প্রভু, এই উটও এখানে থেকে আপনার সেবা করতে চায়।"

সিংহ বলল, "বেশ তো, আমি তাকে অভয় দান করলাম। সে যতদিন খুশি এখানে থাক। তবে তার একটা নাম দরকার। তার নাম রাখ চিত্রকর্ণ।"

তারপর থেকে চিত্রকর্ণ সেখানেই থাকে।

দিন যায়। একবার ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিক জলে জলময়। সিংহ, শেয়াল, বাঘ, কাক কেউই বাসা থেকেই বেরোতে পারে না খাবারের জন্ত। ফলে সবারই চলছে উপবাস।

কয়েক দিন পর খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে বাঘ, শেয়াল ও কাক গেল সিংহের কাছে। গিয়ে বলল, "প্রভু, খাবারের অভাবে তো

আপনার খুবই কষ্ট। তাহলে এক কাজ করেন না, চিত্রবর্ণকে হত্যা করেই না হয়—।"

কথাও শেষ হয়নি তাদের, সিংহ দুই কানে হাত দিয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি যে বল, আমি তাকে অভয় দিয়েছি, তা কি করতে পারি?

এ জগতে সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান হল অভয় দান। ভূমি
দান, সুবর্ণ দান, গো দান এমন কি অন্ন দানও তার মত নয়।"

কাক তো সবার চেয়ে চালাক। সে বলল, "প্রভু, তাহলে আপনি যখন তা করবেন না, তবে আমাদেরই দেহ দান করার প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আপনি দয়া করে আমাকেই ভক্ষণ করুন।"

প্রভুর জীবন রক্ষার কারণই হল নিশ্চিতভাবে সব অমাত্য
(অর্থাৎ রাজা জীবিত থাকলে সবাই জীবিত থাকে) সকল
বৃক্ষ রক্ষা করার যত্নেতেই মানুষ ফলপ্রদ হয়।

সিংহ বলল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি যে বল? আমি বরং প্রাণ পরিত্যাগ করব তবুও একাজ করতে পারব না।"

শেয়াল বলল, "তাহলে প্রভু, আমাকে খান।"

"না না, তুই কেন?" বাঘ বলে উঠল, "প্রভু আমাকেই খাবেন।"

কিন্তু সিংহ কিছুতেই রাজি হয় না।

এসব দেখে শুনে উটও বলে উঠল, "তাহলে প্রভু, আমাকেই খান না কেন?"

বলেও শেষ করেনি সে, বাঘ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তাই ভাল প্রভু।" বলে সে আর সিংহের কথার অপেক্ষা না করেই এক লাফে উটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পেট চিড়ে ফেলল।

তারপর তারা সবাই মিলে উটের মাংস খেল।

"তাই বলছিলাম মহারাজ", মেঘবর্ণ বলতে লাগল, "দুর্জনের মধুর বাক্যে সাধুর বুদ্ধিও নিশ্চয়ই বিচলিত হয়।"

রাজা বলল, "তা তো হল। কিন্তু তুমি কি জন্য শত্রুর মধ্যে বাস করেছ? শত্রুকে অনুনয় করেছ?"

মেঘবর্ণ হেসে বলল, "মহারাজ কার্যসিদ্ধির জন্য লোকে কি না করে?

কার্য্যসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান শত্রুকেও বাঁধে, বহন করে। যেমন বৃদ্ধ সাপ ভেকদের বিনাশ করেছিল।

"কি রকম?" রাজা বলল।

"তাহলে শুনুন।" মেঘবর্ণ বলতে লাগল:

গল্প : এগার
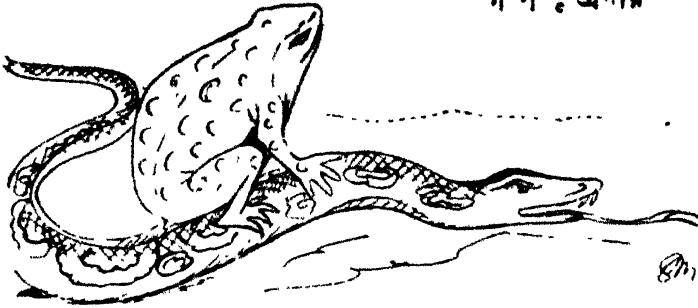
এক পড়ো বাগানে সরোবরের তীরে এক বৃদ্ধ সাপ বাস করত। তার বয়স হয়েছে বড় একটা চলতেও পারে না, সে নির্জীবের মতই পড়ে থাকত।

একদিন এক ব্যাঙ দূর থেকে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে শুয়ে আছেন, খাবার-দাবারেরও সন্ধান করছেন না?"

সাপ মাথা তুলে বলল।

কিছুদিন আগে ব্রহ্মপুরে কৌণ্ডিন্য নামে এক বেদ পারদর্শী ব্রাহ্মণের কুড়ি বছরের এক জোয়ান ছেলেকে কামড়ে মেরে ফেলেছিলাম। ব্রাহ্মণ তো তাতে হাহুতাশ করবে কি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এরমধ্যে অবশ্য গ্রামের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসে হাজির। তারা তখন কোনমতে ব্রাহ্মণের জ্ঞান ফিরিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। একসময়ে কপিল নামে একজন ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আপনি এত কাতর হয়ে পড়েছেন কেন? আপনি কি জানেন না—

জীবন, যৌবন, রূপ, ঐশ্বর্য, ধনসংগ্রহ, পুত্রকন্যাদির সঙ্গে একত্র বাস সবই ক্ষণস্থায়ী এজন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না।

আরে—

নিজের দেহের সঙ্গেই মানুষের চিরকাল সম্বন্ধ থাকে না আর
অন্যের সম্বন্ধে বক্তব্য কি?
বিচার করে দেখুন এ শোক অজ্ঞানের কারণ।
অজ্ঞানই কারণ না হয়ে যদি বিচ্ছেদই শোকের কারণ হয়
তবে দিনে দিনে তা বৃদ্ধি না পেয়ে কিভাবে প্রশমিত হয়?
তাই বলছিলাম, শান্ত হন। শোক করবেন না।"

এসব কথায় কৌণ্ডিন্য খানিক সান্ত্বনা পেয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছেন। আমার আর গৃহবাসের প্রয়োজন নেই। বনেই চলে যাব।"

"না না, সে কি!" কপিল বলল, "বনে যাবেন কেন?
দুঃখ পেয়েও মানুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকে ধর্মাচরণ করে।
সব প্রাণীকেই সমভাবে দেখে। দণ্ডকমণ্ডলু পশুচর্ম পরিধান
ধর্মের চিহ্ন নয়।"

কৌণ্ডিন্য বলল, "তাই হোক।" বলেই তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুই আজ থেকে ভেকদের বাহন হবি।"

তক্ষুনি কপিল বলে উঠল, "আপনার মন অশান্ত হয়ে আছে। উপদেশ নিতে পারছেন না। তবুও বলছি শুনুন—
সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। যদি তা না পারা যায়
তবে সেই সঙ্গ সাধুদের সঙ্গেই করা উচিত। সাধু সঙ্গ ঔষধ
তুল্য।"

যাহোক, এ সব কথাবার্তা শুনে কৌণ্ডিন্য তো শান্ত হলেন, কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। বৃদ্ধ সাপ বলতে লাগল, "তারপর থেকে আমি তোমাদের বহন করবার জন্য পড়ে আছি।"

ব্যাঙ বলল, "তাহলে তো আপনার ভারী কষ্ট। আচ্ছা, আমি যাই।" বলে সে চলে গেল।

"কিন্তু গেল কোথায় জানেন মহারাজ?" মেঘবর্ণ বলতে লাগল, "সে সোজা ব্যাঙেদের রাজাকে গিয়ে সব কথা বলল। ব্যাঙের

রাজাও তক্ষুনি সেখানে চলে এসে সাপের মাথায় চড়ে বসল। আর সাপ কি করবে, সে ব্যাঙের রাজাকে ঘাড়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে ।

না খেয়ে না দেয়ে সাপ তো দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেদিন সে আর চলতে পারছে না। ব্যাঙেদের রাজা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হল ? চলতে পারছ না কেন ?"

সাপ বলল, "কি করব বলুন ? কতদিন খাইনি তাই।"

"না না", ব্যাঙ বলল, "তুমি এক কাজ কর। আজ থেকেই তুমি ব্যাঙ খেতে আরম্ভ কর। আমি আদেশ দিচ্ছি।"

তারপর থেকে সাপ সেই সরোবরের ব্যাঙ খেতে আরম্ভ করল। ব্যাঙ তো আর অগুণতি নয়, কিছুদিনের মধ্যেই সে সেই সরোবরের সব ব্যাঙ খেয়ে ফেলল। তারপরেই সে ধরল ব্যাঙের রাজাকে। সুযোগ সে পেয়েছে, আর কি সে ব্যাঙের রাজাকে ছেড়ে দেয় ? ঝপাং করে সে তাকেও খেয়ে ফেলল।

"তাই বলছিলাম মহারাজ", মেঘবর্ণ বলতে লাগল, "বৃদ্ধ সাপ ভেকেদের বিনাশ করেছিল।"

মহামন্ত্রী শকুনি বলল, "যাকগে যাক্। এসব কথা এখন থাক। এখন সন্ধির কথাই আলোচনা হোক। আমি বলছি কি মহারাজ, রাজা হিরণ্যগর্ভ সন্ধির উপযুক্ত। তার সঙ্গে সন্ধিই করা হোক।"

ব্যঙ্গ করে উঠল রাজা। বলল, "এ কি রকম কথা মন্ত্রী ? যাকে আমরা পরাজিত করেছি, হয় তাকে বিতাড়িত করব নয় সে আমাদের অধীনে থাকবে এর মধ্যে সন্ধির কথা আসে কোথেকে ?"

ঠিক এই সময় দূত শুক পাখি ছুটে এসে বলল, "মহারাজ, সিংহল দ্বীপের রাজা সারস আমাদের জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে অবস্থান করছে।"

"কি, কি ?" লাফিয়ে উঠল রাজা।

ঠিক বুঝে গিয়েছিল কার মন্ত্রণায় রাজা সারস একাজ করেছে।

রাজা গর্জন করে উঠল। বলল, "ঠিক আছে, দাঁড়া। আমি এখুনি গিয়ে তাকে সমূলে উৎপাটিত করব।"

মন্ত্রী হেসে বলল, "মহারাজ—

শরতকালের মেঘের ন্যায় নিরন্তর গর্জন করা উচিত নয়।

মনস্বীজন অন্যের ইষ্টানিষ্ট বাক্যে প্রকাশ করেন না।

প্রভু, এখন এখান থেকে সন্ধি ছাড়া আমরা যাব কি করে? তাছাড়া মহারাজ, ক্রোধ তো করবেন, কিন্তু অনুতাপ যদি করতে হয়।

যে বিষয়ের প্রকৃত কারণ না জেনে ক্রোধের অধীনতা স্বীকার করে সে মূর্খ, ব্রাহ্মণ নকুলের বিষয়ে যেমন অনুতাপ করেছিল তেমনি অনুতপ্ত হতে হবে।"

"কি রকম?" রাজা বলল।

"তাহলে শুনুন।" মন্ত্রী বলতে লাগল:

গল্প ঃ বার
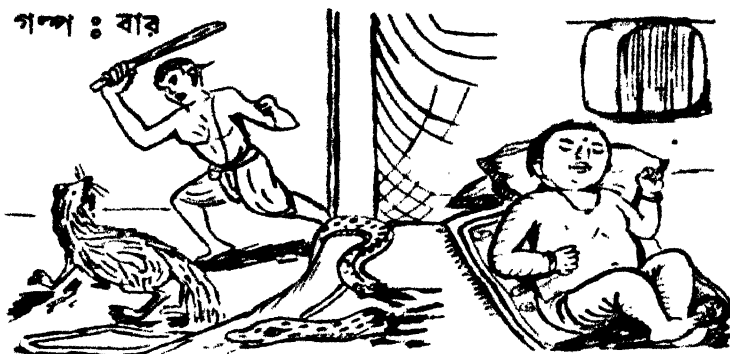
উজ্জয়িনীতে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরিব। দিন আনে দিন খায় এমন অবস্থা।

একদিন ব্রাহ্মণী তাঁর শিশুপুত্রটিকে স্বামীর কাছে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে নদীতে স্নান করতে চলে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকে বলে গিয়েছিলেন তিনি যেন ছেলেটির দিকে একটু নজর রাখেন।

ব্রাহ্মণ তখন দাওয়ায় বসেই শাস্ত্রাদি পাঠ করছেন আর ছেলেটি শুয়ে শুয়েই আপন মনে খেলা করছে। এমন সময় রাজপুরী থেকে খবর এল রাজামশায় কিছু দানের জন্য ডাকছেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ পড়লেন মুশকিলে। ব্রাহ্মণী এখনও স্নান সেরে আসেনি, ছেলেটিকে কার কাছে রেখে যাবেন তিনি? হঠাৎ তার মনে হল, কেন? পোষা নকুলটাই তো আছে। একটুখানি তো সময়। পারবে না নকুলটা ছেলেটাকে দেখতে? নিশ্চয়ই পারবে।

তাই করলেন তিনি। নকুলটাকে এনে ছেলের কাছে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে হয়েছে আরেক কাণ্ড। ব্রাহ্মণও চলে গেছেন, ব্রাহ্মণীও

ফেরেননি স্নান সেরে। তখনকার দিনের উজ্জয়িনী তো। চারদিকে গাছপালাও আছে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণের বাড়ির আশেপাশেও ছিল জঙ্গল। সেখান থেকে এক বিষধর সাপ গুটিগুটি এসে উঠল দাওয়ায়। আর যাবি কোথায়? পড়ে গেল নকুলের সামনে। নকুল তো সাপের শত্রুই। সে তো তক্ষুনি পড়ল লাফিয়ে সাপের ঘাড়ে। ব্যস্, লেগে গেল তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সাপ পারবে কেন নকুলের সঙ্গে? কিছুক্ষণের মধ্যেই নকুল সাপটাকে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। ছেলে তো শিশু। সে তো তখনও শুয়েই আছে। এতবড় কাণ্ড যে হয়ে গেল সে কিছুই জানে না।

ব্রাহ্মণী যে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবে না ব্রাহ্মণ তা জানতেন। তাই ছেলের জন্য তাঁর চিন্তা ছিলই। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরলেন বাড়িতে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই তিনি আঁতকে উঠলেন। একি! বাগানের ঝাপ ঠেলে বাড়িতে ঢুকতেই দেখেন নকুলটার মুখে রক্ত। প্রভু এসেছেন দেখে নকুলটা তো আনন্দে লেজ নেড়ে ছুটে এসেছে ব্রাহ্মণের কাছে। চড়াৎ করে ব্রাহ্মণের মাথায় রক্ত উঠে গেল। কি? ছেলেটাকে কামড়েছিস। বলেই তিনি ছুটে গিয়ে বাগানের এক কোণ থেকে একটা লাঠি নিয়ে পিটিয়েই শেষ করে দিলেন নকুলকে। বেচারা? পালাতেও পারল না। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ব্রাহ্মণ কিন্তু, মহারাজ, একটু পরেই তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। নকুলটাকে পিটিয়েই তো তিনি ছুটে গিয়েছিলেন দাওয়ায় ছেলের কাছে। গিয়ে দেখেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ছেলে। পাশে পড়ে আছে সাপটা—রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তক্ষুনি তিনি বুঝে ফেললেন কি সর্বনাশ করেছেন। কিন্তু তখন আর বুঝে লাভ কি? হাহুতাশই সার হল তার।

"তাই বলছিলাম মহারাজ" মন্ত্রী বলতে লাগল, "ক্রোধের বশীভূত হওয়ার কথা।

কাম (ভোগলিপ্সা), ক্রোধ, লোভ, আনন্দ, সম্মান ও

গর্ব এই ছয় রিপু ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়।"

রাজা বলল, "এ তো তোমার সিদ্ধান্ত।"

মন্ত্রী বলল, হ্যাঁ মহারাজ তাই। যেহেতু :

ধর্মতত্ত্বে অভিনিবেশ, বিচার নৈপুণ্য, স্থির বুদ্ধি, দৃঢ়তা, মন্ত্রগুপ্তি এগুলি মন্ত্রীর শ্রেষ্ঠ গুণ।

তাই বলছিলাম সন্ধির জন্যই এখন চেষ্টা করা উচিত।"

"তা কিভাবে সম্ভব ?" রাজা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা করবার কর।"

তারপর মন্ত্রী তো কথাবার্তা বলে রাজা হিরণ্যগর্ভের দুর্গে গেল।

মন্ত্রী দুর্গে প্রবেশ করতেই হিরণ্যগর্ভের দূত বক রাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ রাজা চিত্রবর্ণের মন্ত্রী শকুনি সন্ধি করতে এখানে আসছেন।"

"সে কি !" রাজা চমকে উঠে বললেন, "এ আবার কি ছলে আসছে কে জানে ?"

মন্ত্রী চক্রবাক বলল, "না মহারাজ সন্দেহ করবেন না। এ দূরদর্শী। অবশ্য মহারাজ—

দুর্জনের দ্বারা যার মন কলুষিত হয়েছে সুজনকেও তার বিশ্বাস নেই। গরম পায়েসে যে শিশুর মুখ পড়েছে দই দেখলেও সে ফুঁ দিয়েই খায়।

যাহোক মহারাজ, তার সন্তোষের জন্য উপহার সামগ্রী আমাদের রাখা উচিত।"

"তাহলে তাই করুন," বলে রাজা আদেশ দিলেন। নানা উপহার নিয়ে মন্ত্রী শকুনির জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে শকুনি এলে তাকে অভ্যর্থনায় খুব খুশি করা হল।

চক্রবাক বলল, "মন্ত্রী, এ রাজ্য এখন আপনাদের। আপনারা যে ভাবে ইচ্ছে রাজ্যভোগ করুন। এ সম্বন্ধে আর কি বলব ! জানেনই তো—

প্রণয় দ্বারা মিত্রকে, সম্মানের দ্বারা আত্মীয়, জ্ঞাতিবর্গকে,
স্ত্রী এবং, ভৃত্যদের অর্থ ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা আর সরল
ব্যবহার দ্বারা উদাসীনকে বশীভূত করবে।

"তা ঠিক।" বলে মন্ত্রী শকুনি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মহারাজ; আমাদের রাজা চিত্রবর্ণ মহাপ্রতাপশালী। আপনি এখন সন্ধির ব্যবস্থা করুন।

চক্রবাক বলল, "কি করতে হবে বলুন।"

রাজা বলল, "আচ্ছা! সন্ধি কত প্রকার হয়?"

মন্ত্রী শকুনি বলল, "সন্ধি হয় ষোল প্রকার। ষোল প্রকার সন্ধির কথাই পণ্ডিতরা বলে গেছেন। এর মধ্যে পরস্পর উপকার ভাব সম্পন্ন প্রতিকার, মৈত্রীভাবসম্পন্ন সঙ্গত, সম্বন্ধভাবসম্পন্ন সন্তান আর উপহার এই চারটি সন্ধিই শ্রেষ্ঠ। তবে তার মধ্যে উপহার সন্ধিই আমার অভিপ্রেত। কারণ:

আক্রমণকারী শত্রু কিছু না নিয়ে যায় না। তাই উপহার
ভিন্ন অন্য সন্ধি সম্ভব নয়।"

রাজা বলল, "আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তি। কি করতে হবে উপদেশ দিন।"

শকুনি বলল, "মহামন্ত্রী—

প্রাণীদের জীবন চন্দ্রের প্রতিবিম্বের মত চঞ্চল। এ জেনে
সর্বদা কল্যাণ আচরণ করবে।

তাহলে আমি ভাবছি সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করে দুইজন রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা হোক। যেহেতু—

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সত্যকে তুলাদণ্ডে ওজন করা
হয়েছিল। তাতে সত্যই ওজনে ভারী হয়েছিল।

"তাহলে তাই হোক।" রাজী হল চক্রবাক।

তারপর রাজা হিরণ্যগর্ভ ও মন্ত্রী শকুনিকে নানা উপহার ইত্যাদি দিয়ে সম্মান দেখিয়ে নিজের মন্ত্রীকে সঙ্গে দিয়ে বিদায় করল।

চক্রবাককে সঙ্গে নিয়ে শকুনিও সোজা গিয়ে উঠল তাদের রাজা চিত্রবর্ণের কাছে। রাজা চিত্রবর্ণও তখন নিজের মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে হিরণ্যগর্ভের মন্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান ও নানা উপহার ইত্যাদি দিয়ে সন্ধির অঙ্গীকার করে বিদায় করল। দুই রাজার সন্ধি স্থাপিত হল।

তারপর শকুনি রাজা চিত্রবর্ণকে বলল, "মহারাজ, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন চলুন দেশে ফিরে যাই।"

"বেশ, চল।" বলে রাজা সেদিনই সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশে ফিরে আসে।

এরপর সকলেই যার যার ইচ্ছা অনুসারে রাজ্যভোগ করতে লাগল।

বিষ্ণুশর্মা তারপর রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "তোমাদের কেমন লাগল বল তো?"

"খুব সুন্দর গুরুদেব।" এক বাক্যে বলে উঠল সবাই। "তাছাড়া রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা কতকিছু শিখলাম।"

গুরুদেব বললেন, "বেশ, তাহলে এস, আমরা প্রার্থনা করি—
বিজয়ী রাজাদের সন্ধি সর্বদা প্রীতিকর হোক, সাধু-সজ্জনরা নিরাপদে থাকুন, পণ্ডিতের যশ দিনে দিনে বর্ধিত হতে থাকুক, নীতি মন্ত্রীদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত থাকুক, আর সর্বদা মহোৎসব হোক।"

প্রার্থনা শেষে গুরুদেব বিষ্ণুশর্মাকে রাজপুত্ররা প্রণাম করলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। তারা ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। আর পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মাও রাজার কাছে গেলেন।

এখন পাঠক এস না, আমরাও সবাই প্রার্থনা করি—
পৃথিবীর সকল লোক সুখী হোক, নিরোগ হোক, সকলের শুভ হোক, কেউ কখনও যেন দুখী হয়ে না থাকে।